POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ؕ وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

'হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! আমরা তোমাদিগকে যে রিযক দান করিয়াছি উহা হইতে খরচ কর সেই দিন আসিবার পূর্বে যেদিন কোন ক্রয়-বিক্রয় এবং বন্ধুত্ব এবং শাফায়াত (সুপারিশ) চলিবে না; বস্তুতঃ কাফেরগণই যালেম।'

(আল-বাকারা: ২৫৫)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 3

গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 31

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার ২ আগস্ট , 2018 19 যুল কাদা 1439 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)বলেছেন: কিশতিয়ে নূহ পুস্তকের 'আমাদের শিক্ষা ' অংশ টুকু প্রত্যেক আহমদীর পড়া উচিত, বরং সম্পূর্ণ বইটিই পড়া উচিত।

আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের শত শত আদেশের মধ্যে একটি ছোট্ট আদেশকেও লংঘন করে, সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে। প্রকৃত মুক্তির পথ কুরআন শরীফই উন্মুক্ত করিয়াছে এবং অবশিষ্ট সব গ্রন্থই ইহার প্রতিচ্ছবি ছিল।

সুতরাং তোমরা কুরআন শরীপকে বিশেষ মনোনিবেশ সহকারে পাঠ কর এবং ইহার সাথে অতি গভীর ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন কর; এরূপ ভালবাসা যাহা অন্য কাহারও সাথে তোমরা কর নাই।

'কিশতিয়ে নূহ' পুস্তক থেকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

আমি শুনিয়াছি যে, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ নাকি হাদীসকে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করে। যদি কেহ এরূপ করিয়া থাকে তবে সে মারাত্মক ভুল করিতেছে। আমি কখনও এইরূপ করিতে বলি নাই, বরং আমার শিক্ষা এই যে, তোমাদের হেদায়াতের জন্য খোদাতালা তিনটি জিনিষ দিয়াছেন। সর্ব প্রথম কুরআন শরীফ* যাহাতে খোদাতালার তৌহীদ (একত্ব), গৌরব ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হইয়াছে এবং ঐ সমস্ত মতভেদের মীমাংসা করা হইয়াছে যাহা ইহুদী ও নাসারাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। যথা- ঈসা ইবনে মরিয়মকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া বধ করা হয় আর তিনি অভিশপ্ত এবং অন্যান্য নবীগণের ন্যায় তাঁহার 'রাফা' (আধ্যাত্মিক উন্নতি) হয় নাই- তাহাদের এই মতভেদ ও ভ্রান্তির মীমাংসা করা হইয়াছে।

তদ্রুপ কুরআন শরীফে তোমাদিগকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন বস্তুর উপাসনা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, তাহা কোন মানুষ বা পশুই হউক চন্দ্র, সূর্য বা কোন নক্ষত্রই হউক। কোন উপায়-উপকরণ কিংবা তোমাদের নিজেদের ব্যক্তিত্বই হউক, সুতরাং তোমরা সাবধান হও এবং খোদাতালার শিক্ষা ও কুরআনের হেদায়াতের বিরুদ্ধে এক পাও অগ্রসর হইও না। আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের শত শত আদেশের মধ্যে একটি ছোট্ট আদেশকেও লংঘন করে, সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে। প্রকৃত মুক্তির পথ কুরআন শরীফই উন্মুক্ত করিয়াছে এবং অবশিষ্ট সব গ্রন্থই ইহার প্রতিচ্ছবি ছিল।

সুতরাং তোমরা কুরআন শরীপকে বিশেষ মনোনিবেশ সহকারে পাঠ কর এবং ইহার সাথে অতি গভীর ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন কর; এরূপ ভালবাসা যাহা অন্য কাহারও সাথে তোমরা কর নাই। কেননা, যেমন খোদাতালা আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন যে, اَلْخَيْرُ كُلُّهٗ فِي الْقُرْاٰنِ অর্থাৎ "সর্বপ্রকার মঙ্গল কুরআন শরীফে নিহিত আছে", এ কথাই সত্য। আফসোস সেই লোকদের জন্য, যাহারা কুরআন শরীফের উপর অন্য কোন বস্তুকে প্রাধান্য দেয়। কুরআন শরীফ তোমাদের সকল সফলতা ও মুক্তির উৎস। তোমাদের ধর্ম-সম্বন্ধীয় এমন কোন প্রয়োজনীয় বিষয় নাই, যাহা কুরআন শরীফে পাওয়া যায় না। 'কেয়ামতের' দিবসে কুরআন শরীফই তোমাদের 'ঈমানের' সত্যাসত্যের মানদন্ড হইবে। কুরআন শরীফ ব্যতীত আকাশের নীচে অন্য কোন গ্রন্থ নাই যাহা কুরআন শরীফের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া তোমাদিগকে 'হেদায়াত' দান করিতে পারে। খোদাতালা তোমাদের প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করিয়াছেন যে, কুরআন শরীফের ন্যায় ধর্মগ্রন্থ তোমাদিগেকে দান করিয়াছেন। তোমাদিগকে আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ধর্মগ্রন্থ তোমাদিগেক দান করা হইয়াছে তাহা যদি খৃষ্টানদিগকে দেওয়া হইত, তাহা হইলে তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত না। এই যে হেদায়াত ও নেয়ামত তোমাদিগকে দান করা হইয়াছে, তাহা যদি ইহুদীদিগকে তওরাতের বদলে দেওয়া হইত, তাহা হইলে তাহাদের কোন কোন ফেরকা কেয়ামতের অস্বীকারকারী হইত না। সুতরাং তোমরা এই নেয়ামতের মর্যাদা উপলব্ধি কর। ইহা অতি প্রিয় নেয়ামত। ইহা এক মহা সম্পদ। যদি কুরআন শরীফ অবতীর্ণ না হইত তাহা হইলে দুনিয়া এক অপবিত্র মাংসপিন্ডের ন্যায় রহিয়া যাইত। কুরআন শরীফ এমন একখানা গ্রন্থ, যাহার তুলনায় অন্য সকল হেদায়াতই তুচ্ছ। ইঞ্জিল আনয়নকারী রূহুল কুদ্দুস এক দুর্বল ও শক্তিহীন পায়রার আকৃতিতে প্রকাশিত হইয়াছিল, যাহাকে এক বিড়ালেও ধরিতে পারে। এই কারণেই খৃষ্টানগণ দিন দিন আধ্যাত্মিক দুর্বলতার গহ্বরে নিপতিত হইতেছে এবং আধ্যাত্মিকতা তাহাদের মধ্যে অবশিষ্ট নাই। কারণ তাহাদের ঈমান কবুতরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু কুরআন আনয়নকারী রূহুল কুদ্দুস এইরূপ এক মহান আকৃতিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, যাহা যমীন হইতে আসমান পর্যন্ত সমগ্র ভূমন্ডল ও নভোমন্ডলকে ছাইয়া ফেলিয়াছিলেন, অতএব কোথায় সেই কবুতর, আর কোথায় এই মহান জ্যোতির্বিকাশ, কুরআন শরীফেও যাহার উল্লেখ আছে!

যদি বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ কোন অন্তরায় না থাকে, তাহা হইলে কুরআন শরীফ এক সপ্তাহের মধ্যে মানুষকে পবিত্র করিতে সক্ষম। যদি তোমরা কুরআন শরীফ হইতে বিমুখ না হও তাহা হইলে ইহা তোমাদিগকে নবী সদৃশ করিতে পারে। কুরআন শরীফ ব্যতীত অন্য কোন্ শাস্ত্র সর্ব প্রথমেই পাঠককে এই প্রার্থনা শিক্ষা দিয়াছে এবং এই আশ্বাস দিয়াছে যে-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ○ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

অর্থাৎ 'আমাদিগকে সেই পুরস্কার লাভের পথ প্রদর্শন কর যাহা পূর্ববর্তগিণকে প্রদর্শন করা হইয়াছে। যাঁহারা নবী-রসূল, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহ্ ছিলেন'

(সূরা ফাতেহা ৬-৭ আয়াত)

সুতরাং নিজেদের সাহস বৃদ্ধি কর এবং কুরআন শরীফের আহ্বানকে অগ্রাহ্য করিও না, কারণ ইহা তোমাদিগকে ঐ সকল আশীষ প্রদান করিতে চায় যাহা তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে প্রদান করা হইয়াছিল। এই কুরআন শরীফ কি তোমাদিগকে বনী ইস্রাঈলদের দেশ এবং তাহাদের বায়তুল মোকাদ্দস দান করেন নাই যাহা আজও তোমাদের অধিকারে আছে?

অতএব হে দুর্বল-বিশ্বাস ও হীন-সাহস ব্যক্তিগণ! তোমরা কি মনে কর, তোমাদের খোদা পার্থিব বিষয়ে তোমাদিগকে বনী ইস্রাঈলদের সমস্ত ঐশ্বর্যের অধিকারী করিয়াছেন কিন্তু আধ্যাত্মিক বিষয়ে তাহাদের অধিকারী করিতে পারেন নাই? বরং খোদাতালা তোমাদিগকে তাহাদের চাইতে অধিক অনুগ্রহ প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন। তিনি তোমাদিগকে তাহাদের ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় সম্পদের উত্তরাধিকারী করিয়াছেন; কিন্তু কেয়ামত পর্যন্ত অপর কেহ তোমাদের উত্তরাধিকারী হইবে না। খোদাতালা তোদাদিগকে ওহী-ইলহাম, (ঐশী-বাণী) মোকালেমা ও

এরপর শেষের পাতায়.....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৬ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর ডেনমার্ক সফর এবং কর্মব্যস্ততার বিবরণ

(অবশিষ্টাংশ)

অতিথিদের প্রতিক্রিয়া

১৭ই মে তারিখে স্টকহোমে হুযুর আনোয়ার প্রদত্ত ভাষণ শুনে অতিথিরা বিভিন্ন ধরণের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। সেগুলির মধ্যে কয়েকটি তুলে ধরা হল। উক্ত ভাষণ ৩১ শে মে (২০১৮)-এর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

এক অতিথি নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন: খলীফার ভাষণ অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মানের ছিল, কেননা ভাষণ থেকে প্রতিভাত হয় যে তিনি সুইডেনের বর্তমান পরিস্থিতির উপর গভীর দৃষ্টি রাখেন। বিশেষ করে অভিবাসীদের বিষয়টি আকর্ষণের কারণ ছিল। সুইডেনে অভিবাসীদের প্রবেশ প্রসঙ্গে খলীফার একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি হল অভিবাসীদের এখানকার সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ হওয়া উচিত এবং সুইডিশ নাগরিকদেরকেও উপেক্ষা করা উচিত নয়। এই কথাটি খুবই উত্তম ছিল। সুইডেনে কোন রাজনীতিক নেতা এমন কথা বলে না।

* এক ব্যক্তি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: এটি আমার জন্য একটি খুবই ভাল অনুষ্ঠান ছিল। ইসলাম এবং আপনাদের ধর্মের আমি এক নতুন রূপ উদ্ঘাটন করলাম। যদি বেশি সংখ্যক মানুষ আপনার কথা শোনে তবে পৃথিবী উন্নত জায়গা হতে পারে।

* একজন অতিথি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: আজ আমি অনেক কিছু শিখতে পেলাম। এটি অনেক উপযোগী ভাষণ ছিল বরং এর থেকেও বেশি। এর থেকে আশার আলো সঞ্চারিত হয়। এখানে খলীফার আগমণে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। খলীফার বাণী আমাদের মনে চেতনা জাগিয়েছে যে, আমরা যেন কোন বিবাদ দেখার পর নিজে নিজেই ঠিক হয়ে যাওয়ার আশায় চোখ বন্ধ করে না থাকি। এটি একটি সদর্থক বার্তা ছিল। আমি এর জন্য কৃতজ্ঞ।

* একজন অতিথি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: এটি একটি দারুণ অভিজ্ঞতা ছিল। আমি মালমো মসজিদে আসার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে খুবই আনন্দিত হয়েছিলাম। কিন্তু এখানে অংশ গ্রহণ করে আমার খুশির অন্ত নেই। আমি বেশ প্রভাবিত হয়েছি। আমি খলীফার বার্তা শুনেছি। আমি এর মধ্যে প্রজ্ঞা, ভালবাসা ও শান্তির বাণী পেয়েছি। এটি কেবলই ভালবাসার বাণী ছিল। খলীফার ভাষণ যত এগিয়েছে আমাকে তা তত বেশি প্রভাবিত করেছে।

* একজন অতিথি বলেন: সকলকে একস্থানে সমবেত করার বাসনা খুবই ভাল। কেননা বর্তমান পৃথিবীতে এমন সব শক্তি কাজ করছে যা মানুষকে মানুষ থেকে দূরে করে দিতে চায়। সকলকে একত্রিত করার প্রচেষ্টায় আপনারা সার্বিকভাবে সফল হয়েছেন। কেননা আমরা পরস্পর মিলিত হলে আমাদের সামনে সত্য প্রকাশিত হয় এবং আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি ঘটে। আমরা হিংসা-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে লড়ার উৎসাহ পাই। ইসলামের বিরুদ্ধে অনেক বিদ্বেষ লক্ষ্য করা যায়। অনেকেই আহমদীয়া জামাতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত নয়। আমরা মিলিত হওয়ার ফলে পারস্পরিক বোঝাপড়া বৃদ্ধি পায়। এইভাবে আমরা শান্তি ও সৌহার্দ্যর বাণীর প্রসার করতে পারি।

*একজন অতিথি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: আমি আনন্দিত যে আপনারা আমাকে এখানে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। খলীফার কথা আমার খুব ভাল লেগেছে। আপনি যে বিষয়ের উপর কথা বলেছেন তাতে আমি আনন্দিত। মুহাজির বা অভিবাসীদের দায়িত্বাবলী, সমাজের প্রতি তাদের কর্তব্য এবং সুইডিশ জাতির এই সকল মুহাজিরদের প্রতি কেমন যত্ন হওয়া উচিত, এসব সম্পর্কে এখানকার অধিকাংশ ধর্মীয় নেতাগণ আলোচনা করে না। এটি বস্তুনিষ্ঠ ভাষণ ছিল। তাঁর ভাষণে এই বিষয়ের উপর গুরুত্ব ছিল যে, মুহাজিররা যেন সমাজের অংশ রূপে সমন্বিত হয়ে যায় এবং এর পাশাপাশি সুইডিশ সমাজ ও রাজনীতিকদের উদ্দেশ্যেও এই বার্তা ছিল যে, সমাজকে কিভাবে উন্নততর করা যায়।

* একজন অতিথি প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন: এটি অত্যন্ত আনন্দদায়ক বিষয় যে, একজন আধ্যাত্মিক ব্যক্তির ভাষণ আমাদের কেবল পছন্দই হচ্ছিল তা নয় বরং ভাষণের প্রভাব হৃদয়কে স্পর্শ করছিল। এটি আমাকে অনেক শক্তি জুগিয়েছে আর পৃথিবীতে ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে এমন সব সমস্ত পরিস্থিতিকে পরিবর্তন করার জন্য আমার মধ্যে একটি নতুন উদ্যমের সঞ্চার করেছে । আমরা সেই সকল সমস্যার সমাধান সূত্র বের করতে পারি। ইউরোপের প্রতিবেশী দেশগুলিতে যুদ্ধ-পরিস্থিতির কারণে মুহাজিরদের সমস্যা দেখা দিয়েছে। যদি আমরা সকলে " ভালবাসা সকলের তরে ঘৃণা নয়কো কারোর পরে"-র বাণীর প্রতি কর্ণপাত করি এবং এর উপর অনুশীলন করি তবে এই সমস্যাটিরও সমাধান হতে পারে।

একজন অতিথি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: আমি এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে আনন্দিত। আমার মতে খলীফার বার্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বার্তা শান্তি, ভালবাসা, শান্তি ও সৌহার্দ্যের বাণী। প্রত্যেকের এই বাণীর উপর অনুশীলন করা উচিত। আমি খুবই প্রভাবিত হয়েছি। এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমি এক নতুন উদ্যম পেয়েছি।

একজন অতিথি বলেন: যখন আপনি জামাতে আহমদীয়ার উদ্দেশ্য এবং এর পৃষ্ঠভুমির দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং পৃথিবী জুড়ে খলীফা ও আহমদীদের সেবার দিকে নজর দেন কেবল তখনই আপনি ইসলামের সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারবেন।

একজন অতিথি বলেন: পরমত সহিষ্ণুতা এবং অপরকে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদানের মাধ্যমেই যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, এই বিষয়ে খলীফার বার্তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিশেষ করে শরণার্থী সমস্যা প্রসঙ্গে এ কথাটি খুবই ভাল লেগেছে যে, ঐ সকল শরণার্থীদেরও দায়িত্ব হল স্বাধীনতার প্রতি সম্মান জানানো এবং সমাজের কল্যাণকর অংশে পরিণত হওয়া। খলীফা স্থানীয় মানুষদের মধ্যে চেতনাবোধ তৈরী করেছেন যে তারা যেন শরণার্থীদের সংকটের সময় তাদের সহায়তা করে এবং তাদের কাছ থেকে বেশি প্রত্যাশা না করে। খলীফা হলেন শান্তির প্রতীক। আমি তাঁর কাছ থেকে ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু শিখেছি।

* ইরাক থেকে আগত একজন খ্রীষ্টান শরণার্থী সালাম সাহেবও এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে এসেছিলেন। তিনি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: খলীফার কথা খুব ভাল ছিল। তিনি কেবল শান্তি ও পারস্পরিক ঐক্যের বিষয়ে কথা বলেছেন। আমি ইরাকে কখনো এমন কথা শুনিনি। সেখানে মানুষ ইসলামের সেই চিত্র উপস্থাপন করে না যা আপনাদের খলীফা এখানে উপস্থাপন করছেন। যদি ইরাক খলীফার কথা শুনত তবে আমাদেরকে আজ দেশ ত্যাগ করে এখানে আসতে হত না আর এখানে সুইডিশদের সামনে ভিখারী হয়ে থাকতে হত না। এখানকার সুইডিশরা মনে করে যে, আমি কোন অধিকার আদায় করতে এসেছি। এই অনুভুতি খুবই পীড়াদায়ক। পৃথিবীতে বিরাজমান পরিস্থিতি সম্পর্কে খলীফা সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন। আপনাদের জামাত সমস্ত মুসলিম দলের থেকে উন্নত।

* একজন অতিথি জন উইন ফল্ট নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন: খলীফার ভাষণ উৎকর্ষের চরমে ছিল। এর কারণ হল, খলীফার কথা গুলি হৃদয় থেকে উদ্ভুত এবং তা হৃদয়ে প্রভাব ফেলে। রাজনীতিক নেতারা মানুষকে তুষ্ট করার জন্য কথা বলে। কিন্তু খলীফা প্রকাশ্যে এবং সাহসিকতার সঙ্গে কথা বলেন। খলীফা কিছু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশ প্রদান করেছেন। আমি ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু জানার সুযোগ পেয়েছি। আমি এবিষয়ে একমত যে, মুহাজিরদেরকে নতুন দেশে এসে এই দেশের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। আর প্রশাসন তাদের কাছে কি প্রত্যাশা রাখে সে সম্পর্কেও প্রশানের উচিত শরণার্থীদেরকে সচেতন করা। খলীফা বলেন উভয় পক্ষ থেকে সদর্থক আচরণের উপরই শান্তি নির্ভর করছে। মুহাজিরদেরকে আমাদেরও উচিত স্বাগত জানানো। রাজনৈতিক বিষয়ে আমার বিশেষ আগ্রহ রয়েছে এই কারণে শরণার্থী সমস্যার উপর অসংখ্য প্রবন্ধ পড়েছি। কিন্তু আমি খলীফার মত কার্যকরী বিশ্লেষণ কখনো পড়িনি। অনেক মানুষের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে।

* একজন অতিথি যার নাম ইভা লফজ্রেম, তিনি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: ১৯৭০ সাল থেকে আমি আহমদীদেরকে চিনি ও জানি। পশ্চিম আফ্রিকায় থাকাকালীন আমি কিছু আহমদীদের সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলাম। আমি আপনাদের খলীফার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছি। তিনি সুইডেন সম্পর্কে অনেক কিছু জানেন। তিনি এমন অনেক কিছু বলেছেন যা সম্পর্কে আমি মোটেও জানতাম না। খলীফা রাজনৈতিক বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখলেন এবং সমস্যার সমাধান বলে দিলেন। আমি তাঁর কথার উপর শতভাগ একমত।

এরপর ৮ পাতায়.....

জুমআর খুতবা

হযরত আম্মার (রা.)-এর জীবনী সম্পর্কে গত খুতবায় আলোচিত বিষয়গুলি ছাড়া আরও কিছু ঘটনাবলীর বর্ণনা।

অনুরূপভাবে হযরত আবু লুবাবা বিন আব্দুল মানযার জীবনী এবং তাঁর সম্পর্কে কিছু ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর বর্ণনা।

আল্লাহ্ তা'লা এ যুগে এম.টি.-রূপী এমন একটি মাধ্যম দান করেছেন যার কল্যাণে আমরা চাইলে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করতে পারি। এতে কুরআনের দরস হয়, হাদীসের দরস হয়, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলীর ওপর দরস হয়ে থাকে, খুতবা রয়েছে, খিলাফতের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। অনুরূপভাবে অন্যান্য বক্তৃতা এবং জলসা রয়েছে। কাজেই অন্ততপক্ষে এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা নিজেদের এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকেও যদি এই মাধ্যমের সাথে সম্পৃক্ত করি তাহলে এটি তরবিয়তের অতি উত্তম একটি মাধ্যম আর এটি সকল প্রকার ফেৎনা ও নৈরাজ্য থেকেও রক্ষা করে এবং ধর্মীয় জ্ঞানও বৃদ্ধি করে। অতএব জামা'তের সদস্যদের এদিকে অনেক বেশি দৃষ্টি দেওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লা এম.টি.এ রূপি যে নেয়ামত দিয়েছেন এর সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করুন।

লাহোরের কাযি মহম্মদ সালমান সাহেবের পুত্র শ্রদ্ধেয় কাযি শাবান আহমদ খান সাহেবের শাহাদত। শহীদ মরহুমের প্রশংনীয় গুণাবলীর উল্লেখ এবং জানাযা গায়েব।

শেঠ মহম্মদ গওস সাহেবের কন্যা শ্রদ্ধেয়া আমাতুল হাই সাহেবার মৃত্যু, তাঁর প্রশংসনীয় গুণাবলীর বর্ণনা এবং জানাযা হাযের।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ২৯ জুন, ২০১৮, এর জুমুআর খুতবা (২৯ এহসান , ১৩৯৭ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন: গত জুমুআর খুতবায় আমি হযরত আম্মার (রা.) সম্পর্কে বর্ণনা করছিলাম। তাঁর সম্পর্কে আরো কিছু রেওয়ায়েত বা ঘটনা বাকি ছিল যা আজ বর্ণনা করব।

হযরত হাসান (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত, হযরত আমর বিন আস বলেন, মহানবী (সা.) যে ব্যক্তিকে তাঁর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত ভালবেসেছেন আমি আশা করি কখনো এমনটি হবে না যে, আল্লাহ্ তা'লা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। লোকেরা বলল, আমরা দেখতাম মহানবী (সা.) তোমাকে ভালোবাসতেন আর তোমাকে আমীর বা গভর্ণর নিযুক্ত করেছেন। হযরত আমর বিন আস বললেন, আল্লাহ্ই ভালো জানেন, তিনি (সা.) আমাকে ভালোবাসতেন নাকি আমার মনোতুষ্টি করতেন। কিন্তু আমরা দেখতাম যে, তিনি এক ব্যক্তিকে ভালোবাসতেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, তিনি কে? হযরত আমর বিন আস বলেন, হযরত আম্মার বিন ইয়াসের হলেন সেই ব্যক্তি যাকে মহানবী (সা.) সব সময় ভালোবেসেছেন। একথা শুনে লোকেরা বলল, সিফফিনের যুদ্ধে তোমরাই তো তাঁকে শহীদ করেছ। হযরত আমর বিন আস তখন আমীর মুয়াবিয়ার পক্ষে ছিলেন। হযরত আমর বিন আস বলেন, খোদার কসম আমরাই তাঁকে হত্যা করেছি।

আরেকটি রেওয়ায়েতে এসেছে হযরত আমার বিন আস বলতেন, দুই ব্যক্তি সম্পর্কে আমি সাক্ষ্য দিতে পারি যাদেরকে মহানবী (সা.) নিজের মৃত্যু পর্যন্ত ভালোবাসতেন আর তারা হলেন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ এবং হযরত আম্মার বিন ইয়াসের।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৯৯, আম্মার বিন ইয়াসির)

আবু বকর বিন মুহাম্মদ আমর বিন হাযম তাঁর পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আম্মার বিন ইয়াসেরকে যখন শহীদ করা হয় তখন আমর বিন হাযম, আমর বিন আস-এর কাছে আসেন এবং বলেন, আম্মারকে শহীদ করা হয়েছে আর আমি মহানবী (সা.) কে বলতে শুনেছি যে, বিদ্রোহী গোষ্ঠি তাঁকে শহীদ করবে। একথা শুনে হযরত আমর ভীত হয়ে হযরত মুয়াবিয়ার কাছে যান। হযরত মুয়াবিয়া জিজ্ঞেস করেন, সব ঠিক আছে তো? তিনি বলেন, হযরত আম্মার বিন ইয়াসেরকে শহীদ করা হয়েছে। হযরত মুয়াবিয়া বলেন, আম্মারকে শহীদ করা হয়েছে তো কী হয়েছে? হযরত আমর বলেন, আমি মহানবী (সা.) কে একথা বলতে শুনেছি যে, বিদ্রোহী গোষ্ঠি তাঁকে হত্যা করবে। একথা শুনে মুয়াবিয়া বলেন, তাঁকে কি আমরা শহীদ করেছি? তাঁকে তো হযরত আলী এবং তার সাথিরা হত্যা করিয়েছে যারা তাঁকে এনে আমাদের বর্শা বা তরবারির সামনে রেখে দিয়েছে।

(আল মুসতাদরিক আলাস সালেহীন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৭৪, পুস্তক-মারেফাতুস সাহাবা যিকরু মানাকিব আম্মার বিন ইয়াসির, হাদীস: ৫৭২৬, ১৯৯৭ সালে দারুল হুরমাইনে প্রকাশিত)

যাহোক হযরত আমর বিন আস-এর মাঝে পুণ্য ছিল যার জন্য তিনি উদ্বিগ্ন হন কিন্তু আমীর মুয়াবিয়া এটিকে ততটা গুরুত্ব দেন নি। যাহোক সাহাবীরা যখন কোন রেওয়ায়েত শুনতেন বা নিজেরাই কখনো মহানবী (সা.) বর্ণিত কোন সতর্কবাণী বা শুভসংবাদ শুনতেন তখন খুবই চিন্তিত হতেন।

হযরত আয়েশা হযরত আম্মার সম্পর্কে বলেন, "হযরত আম্মার আপাদমস্তক ঈমানে সমৃদ্ধ ছিলেন।"

(ফাযায়েলু সাহাবা, রচয়িতা ইমাম আহমদ বিন হাম্বিল, পৃষ্ঠা: ৫২০, ফাযায়েলু সৈয়্যদানা আম্মার বিন ইয়াসির, রচয়িতা: নবীদ আহমদ বাশার, ২০১৬ সালে বুক কর্ণার প্রিন্টার্স পাবলিশার্স দ্বারা প্রকাশিত)

হযরত খাব্বাব হযরত উমরের সকাশে উপস্থিত হলে হযরত উমর তাকে বলেন কাছে আস, এই বৈঠকে আসার বা বসার অধিকার আপনার চেয়ে বেশি আম্মার ছাড়া আর কারো নেই। এরপর হযরত খাব্বাব হযরত উমরকে তাঁর কোমরের বিভিন্ন আঘাতের চিহ্ন দেখাতে থাকেন, যা মুশরেকদের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছিল।

(সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুস সুন্নাহ, বাব ফাযায়েলু খাব্বাব, হাদীস-১৫৩)

হযরত উমর তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করছিলেন কেননা তিনি প্রাথমিক যুগে অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। একই সাথে হযরত আম্মার সম্পর্কেও তিনি বলেন যে, তিনিও অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন।

হযরত আলীর সাক্ষ্য সম্পর্কেও হযরত আম্মারের একটি রেওয়ায়েত রয়েছে যা মহানবী (সা.)-এর একটি ভবিষ্যদ্বাণী-সংক্রান্ত। হযরত আম্মার বিন ইয়াসেরের পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার যাতুল আশিরার যুদ্ধে আমি হযরত আলীর সফরসঙ্গী ছিলাম। মহানবী (সা.) যখন এক জায়গায় যাত্রাবিরতি দেন তখন আমরা বনু মুদলেজের কিছু মানুষকে দেখি যারা নিজেদের বাগানের ঝর্ণায় কাজ করছিল। হযরত আলী আমাকে বললেন, চল এদের কাছে গিয়ে দেখি, এরা কীভাবে কাজ করে। আমরা তাদের কাছে যাই, কিছু ক্ষণ পর্যন্ত আমরা তাদের কাজ দেখি, এরপর আমাদের ঘুম পায় তাই আমি ও হযরত আলী ফিরে আসি এবং একটি বাগানে মাটিতেই আমরা শুয়ে পড়ি। খোদার কসম! মহানবী (সা.)ই এসে আমাদেরকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলেন। তিনি আমাদের পায়ে নাড়া দিচ্ছিলেন আর আমরা ধূলিধূসরিত ছিলাম। সেদিন মহানবী (সা.) হযরত আলী (আ.)-কে সম্বোধন করে বলেন যে, হে আবু তুরাব! (তাঁর গায়ে যে ধূলোবালি লেগেছিল,

হয়তো তাই দেখে তিনি (সা.) তাকে আবু তুরাব বলেছেন) আমি কি তোমাদেরকে সেই দুই ব্যক্তি সম্পর্কে অবহিত করব না যারা মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশি হতভাগা? আমরা বললাম, কেন নয় হে আল্লাহ্‌র রসূল! তিনি বলেন, একজন হলো সামুদ জাতির সেই শ্বেত-শুভ্র ব্যক্তি যে উটের গোড়ালি কেটে দিয়েছিল আর দ্বিতীয়জন হলো সে ব্যক্তি হে আলী! যে তোমার মাথায় আঘাত হানবে আর তোমার দাড়িকে রক্তে রঞ্জিত করবে।"

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বিল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৬১, আম্মার বিন ইয়াসির, হাদীস-১৮৫১১, ১৯৯৮ সালে বেরুতে আলেমুল কুতুব দ্বারা প্রকাশিত)

আবু মিজলায বলেন, একবার হযরত আম্মার বিন ইয়াসের সংক্ষিপ্ত নামায পড়েন, তাঁকে কেউ এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি মহানবী (সা.)-এর নামাযে বিন্দু মাত্র ব্যতিক্রমও করি নি। (মসনদ আহমদ বিন হাম্বিল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৬১, আম্মার বিন ইয়াসির, হাদীস-১৮৫১১, ১৯৯৮ সালে বেরুতে আলেমুল কুতুব দ্বারা প্রকাশিত)

এই হাদিসের একটি বিস্তারিত বিবরণ এভাবে পাওয়া যায় যা আবু মিজলায বরাতেই বর্ণিত হয়েছে, একবার হযরত আম্মার বিন ইয়াসের আমাদের খুবই সংক্ষিপ্ত নামায পড়ান, মানুষ এতে বিস্মিত হয়, হযরত আম্মার বলেন, আমি কি রুকু এবং সেজদা পুরোপু রি আদায় করি নি? তারা বললো, কেন নয়। হযরত আম্মার বলেন, আমি এতে একটি দোয়া করেছি যা মহানবী (সা.) করতেন আর সেই দোয়াটি হলো

اَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ
أَحْيِنِيْ مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِّي وَتَوَفَّنِيْ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّيْ۔ اَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَكَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا وَالْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنٰى وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلٰى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلٰى لِقَائِكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ ضَرَّاءَ مَضَرَّةٍ وَمِنْ فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ۔ اَللّٰهُمَّ زَيِّنَّا بِزِيْنَةِ الْإِيْمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مَهْدِيِّيْنَ۔

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! অদৃশ্যের জ্ঞান কেবল তোমারই রয়েছে, পুরো সৃষ্টির উপর তোমার শক্তিমত্তার আধিপত্য রয়েছে। তুমি আমাকে ততক্ষণ জীবিত রাখ যতদিন তোমার জ্ঞানে আমার জীবন আমার জন্য কল্যাণকর আর আমাকে তখন মৃত্যু দাও যখন মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর হবে। হে আল্লাহ্! আমি অদৃশ্য ও দৃশ্যে তোমার নিকট তোমার ভীতি কামনা করি আর তোমার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টিতে সত্য বলার শক্তি যাচনা করি এবং সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় মধ্যম পন্থা অবলম্বনের আর প্রফুল্লচিত্তে তোমার চেহারা অবলোকন করার দৃষ্টিশক্তি এবং তোমার সাক্ষাতের আগ্রহ তোমার কাছে যাচনা করি। আর আমি কোন কষ্টদায়ক বিষয় ও পথভ্রষ্টকারী ফিতনা থেকে তোমার আশ্রয়ে আসছি। হে আল্লাহ্! আমাদেরকে ঈমানের সৌন্দর্যে সজ্জিত কর এবং হেদায়াতপ্রাপ্ত লোকদের জন্য পথপ্রদর্শক বানিয়ে দাও।

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বিল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৬২, আম্মার বিন ইয়াসির, হাদীস-১৮৫১৫, ১৯৯৮ সালে বেরুতে আলেমুল কুতুব দ্বারা প্রকাশিত)

রেওয়ায়েতে এটিও বর্ণি ত আছে যে, হযরত আম্মার বিন ইয়াসের প্রত্যেক জুমুআয় মিম্বারে সূরা ইয়াসিন তেলাওয়াত করতেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৯৩, আম্মার বিন ইয়াসির)

হারেস বিন সোহেল বলেন, কোন ব্যক্তি হযরত উমরের কাছে হযরত আম্মারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে এবং তাঁর সম্পর্কে কুৎসা করে । হযরত আম্মার এই কথা জানার পর দোয়ার জন্য হাত উঠান এবং দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ্! এ ব্যক্তি যদি যে আমার ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে তাহলে এ পৃথিবীতে তাকে স্বাচ্ছন্দ্য ও সচ্ছলতা দান কর আর তার পরকালকে আবৃত কর।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৯৪, আম্মার বিন ইয়াসির)

আবু নওফেল বিন আবি আকরাব বলেন, হযরত আম্মার বিন ইয়াসের সবচেয়ে বেশি নীরব থাকতেন এবং সবচেয়ে বেশি মিতবাক ছিলেন। তিনি বলতেন, আমি নৈরাজ্য থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করি। আমি নৈরাজ্য বা ফেতনা থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করি।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৯৪, আম্মার বিন ইয়াসির)

খ্যায়সামা বিন আবি সাবরা বলেন, আমি মদীনায় এসে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করলাম যে, তুমি আমাকে কোন নেক ব্যক্তির সাহচর্য দাও। এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে হযরত আবু হুরায়রার সাহচর্য দান করেন। হযরত আবু হুরায়রা আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কোন জাতির বা গোত্রের লোক? আমি বলি যে, আমার কুফার অধিবাসী, আমি জ্ঞান এবং কল্যাণ আরহণের জন্য এসেছি। হযরত আবু হুরায়রা বলেন, তোমাদের অঞ্চলে কি মুজাবুদ্ দা'ওয়া (অর্থাৎ যার দোয়া কবুল হয়ে থাকে) হযরত সাদ বিন আবি ওয়াকাস, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পানি ও জুতা বহনকারী হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর গোপনীয়তা রক্ষাকারী হযরত হুযায়ফা বিন ইয়ামান এবং হযরত আম্মার বিন ইয়াসের যার সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মুখ নিঃসৃত বাণী ছিল, খোদা তা'লা তাকে শয়তান থেকে নিরাপত্তা দিয়ে রেখেছিলেন আর দুই ঐশী গ্রন্থ ইঞ্জিল ও কুরআনের জ্ঞানে জ্ঞানী হযরত সালমান (রাজিআল্লাহু আনহুম আজমাইন) নেই? (আল মুসতাদরাক আলাস সালেহীন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৮১) তিনি (রা.) বলেন, এরা থাকা সত্ত্বেও তাদের মাধ্যমে কেন উপকৃত হও নি?

মুহাম্মদ বিন আলী বিন হানফিয়া বলেন, হযরত আম্মার বিন ইয়াসের মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হন। সেই সময় তিনি (সা.) অসুস্থ ছিলেন। মহানবী (সা.) হযরত আম্মারকে বলেন, আমি কি তোমাকে সেই 'দম' শিখাব যা জিব্রাইল আমার ওপর করেছেন? হযরত আম্মার বলেন, আমি বলি- হে আল্লাহ্‌র রসূল! অবশ্যই শেখান। তিনি বলেন, মহানবী (সা.) তখন তাকে সেই দম শিখিয়ে দেন আর তা হলো- بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ وَاللّٰهُ يَشْفِيْكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ يُّؤْذِيْكَ অর্থাৎ আমি আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করে সমস্ত দম করছি, আল্লাহ্ তোমাকে সেই সকল রোগ থেকে আরোগ্য দান করুন যা তোমাকে কষ্ট দেয়, তুমি এটিকে আঁকড়ে ধর আর আনন্দিত হও। (আল মুসতাদরাক আলাস সালেহীন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৮২)

হযরত আনাস (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, জান্নাত হযরত আলী, হযরত আম্মার, হযরত সালমান এবং হযরত বেলাল (রা.)-এর জন্য সাগ্রহে অপেক্ষমান।

(আল ইসতিয়াব, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১১৩৮, আম্মার বিন ইয়াসির)

হযরত হুযায়ফা (রা.) বলেন, আমরা মহানবী (সা.)-এর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি (সা.) বলেন, আমি জানি না, তোমাদের মাঝে আমি কতদিন আছি। তোমরা আমার পর এসব লোকের আনুগত্য করবে। তিনি আবু বকর এবং উমরের দিকে ইঙ্গিত করেন আর বলেন, আম্মারের পন্থা অবলম্বন করো আর ইবনে মাসউদ তোমাদের যা বলবে তার সত্যায়ন করো।

(সুনানে তিরমিযী, আবওয়াবুল মানাকিব, বাব মানাকিবু আম্মার বিন ইয়াসির)

হযরত আম্মারের প্রেক্ষাপটে গত সপ্তাহে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, তিনি নৈরাজ্যবাদীদের প্রতারণার শিকার হন। যখন হযরত উসমান (রা.) তাঁকে গভর্ণর সম্পর্কে তদন্ত করতে পাঠিয়েছিলেন তখন নৈরাজ্যবাদী শ্রেণির কাছে চলে যান যার ফলে পুরোপুরি তদন্ত হয় নি। এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এক জায়গায় বলেন, যে নৈরাজ্য মাথাচাড়া দেয় আর হযরত উসমান (রা.) এবং খেলাফতের বিরুদ্ধে যেসব বিষয় সামনে আসে তা উৎপত্তির কারণ হলো তাদের সঠিক তরবীয়ত হয় নি। কেন্দ্রে তারা অনেক কম আসত, কুরআনের জ্ঞানও অনেক স্বল্প ছিল এবং ধর্মের জ্ঞান ছিল অল্প। তাই তিনি সেই সময় জামা'তকে নসীহত করে বলেন, এটি থেকে তোমাদের শিক্ষা ও নসীহত গ্রহণ করা উচিত। কাজেই, প্রধানত কুরআনের জ্ঞান অর্জন কর, কেন্দ্রের সাথে সব সময় যোগাযোগ রক্ষা কর এবং ধর্মের জ্ঞান অর্জন কর, যেন ভবিষ্যতেও জামা'তের মাঝে কোন ফেৎনা মাথাচাড়া দিলে তোমরা সব সময় নিরাপদ থাকতে পার।

(আনওয়ারে খিলাফত, আনওয়ারুল উলুম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৭১)

অতএব আমাদের এ কথা সব সময় স্মরণ রাখা উচিত। এখন সবার জন্য কেন্দ্রে আসা সম্ভব নয় আর খিলাফতের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্কও সেভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয় কিন্তু একটি বিষয়ে কোন বাধা নেই আর তা হলো কুরআনের এবং ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করা। এটি এখন সবার জন্য সম্ভব এবং সবার নাগালের ভিতর রয়েছে। এছাড়া আল্লাহ্ তা'লা এ যুগে এম.টি.-রূপী এমন একটি মাধ্যম দান করেছেন যার কল্যাণে আমরা চাইলে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করতে পারি। এতে কুরআনের দরস হয়, হাদীসের দরস হয়, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলীর ওপর দরস হয়ে থাকে, খুতবা রয়েছে, খিলাফতের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। অনুরূপভাবে অন্যান্য বক্তৃতা এবং জলসা রয়েছে। কাজেই অন্তত পক্ষে এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা নিজেদের এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকেও যদি এই মাধ্যমের সাথে সম্পৃক্ত করি তাহলে এটি তরবিয়তের অতি উত্তম একটি মাধ্যম আর এটি সকল প্রকার ফেৎনা ও নৈরাজ্য থেকেও রক্ষা করে এবং ধর্মীয় জ্ঞানও বৃদ্ধি করে। অতএব জামা'তের সদস্যদের এদিকে অনেক বেশি দৃষ্টি দেওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লা এম.টি.এ রূপি যে নেয়ামত দিয়েছেন এর সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করুন।

হযরত আবু লুবাবা বিন আব্দুল মুনযার হলেন আরেকজন সাহাবী, সংক্ষেপে তার কথাও উল্লেখ করব। হযরত আবু লুবাবার নাম সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ তার নাম বশীর বলে থাকেন, ইবনে ইসহাকের মতে তার

নাম হলো রাফাআ। আল্লামা যামখশরী তার নাম লিখেছেন মারওয়ান। যাহোক তিনি আনসারদের আওস গোত্রের সদস্য ছিলেন এবং বারো জন সর্দারের একজন ছিলেন আর বয়আতে উকবায় যোগদান করেন।

বদরের যুদ্ধের জন্য মদীনা থেকে বের হওয়ার সময় মহানবী (সা.) নিজের অবর্তমানে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উম্মে মাকতুমকে মদীনার আমীর নিযুক্ত করেন কিন্তু তিনি যখন রওহা নামক স্থানে পৌঁছেন যা মদীনা থেকে ছত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত তখন খুব সম্ভব এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, আব্দুল্লাহ্ একজন অন্ধ মানুষ আর কুরাইশ বাহিনীর আগমনের সংবাদের দাবি ছিল তাঁর (সা.) অবর্তমানে মদীনার ব্যবস্থাপনাও যেন দৃঢ় থাকে, তাই তিনি আবু লুবাবা বিন মুনযারকে মদীনার আমীর নিযুক্ত করে ফেরৎ পাঠান আর হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উম্মে মাকতুম সম্পর্কে নির্দেশ দেন যে, তিনি শুধু নামাযের ইমামতি করবেন আর প্রশাসনিক কাজ হযরত আবু লুবাবা করবেন। যাহোক এভাবে তিনি মাঝ পথ থেকে ফিরে যান।

ইবনে ইসহাক বলেন, মহানবী (সা.) তার জন্য মালে গনিমতের (লুঠের মালের) অংশ নির্ধারণ করেন।

(আল আসাবা ফি তামীযিস সাহাবা, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৯০)

(আততাবকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৯৪, আম্মার বিন ইয়াসির)

বদরের যুদ্ধে যাওয়ার পথে মহানবী (সা.), হযরত আলী এবং হযরত আবু লুবাবা পালাক্রমে উটে আরোহণ করতেন। হযরত আলী এবং হযরত আবু লুবাবা অত্যন্ত পিড়াপিড়ি করে বলেন যে, আমরা পায়ে হেঁটে যাই আর হুযূর বাহনে বসে থাকুন, কিন্তু মহানবী (সা.) তা মানেন নি এবং মুচকি হেসে বলেন, হাঁটার ক্ষেত্রে তোমরা দুজন আমার চেয়ে বেশি সামর্থ্যবান নও আর পুরস্কার বা প্রতিদানের বিষয়েও আমি তোমাদের উভয়ের চেয়ে কম আকাঙ্ক্ষী নই।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা: হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ পৃষ্ঠা: ৩৫৩) (আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৯৪, আম্মার বিন ইয়াসির)

বদরের যুদ্ধের পর মহানবী (সা.) হযরত যায়েদ বিন হারেসাকে মদীনাবাসীর উদ্দেশ্যে শুভসংবাদ দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেন। যায়েদ মহানবী (সা.)-এর উটে বসে এসেছিলেন। নামাযের জায়গায় পৌঁছে তিনি তাঁর বাহনে বসেই উচ্চস্বরে বলেন, রবিয়ার উভয়পুত্র উতবা ও শায়বা, হাজ্জাজের উভয়পুত্র আবু জাহল ও আবুল বাখতারি, জামআ বিনুল আসওয়াদ এবং উমাইয়া বিন খালফ এরা সবাই নিহত হয়েছে আর সোহায়েল বিন আমর এবং আরো অনেককেই বন্দি করা হয়েছে। মানুষ যায়েদ বিন হারেসার কথা বিশ্বাস করছিল না আর তারা বলছিল যায়েদ পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছেন! একথাটি মুসলমানদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার করে। (মুনাফিক ও বিরোধীরা এমন কথা বলত।) আসলে তারা নিজেরা ভীতত্রস্তও হয়ে যায়, তাই তারা এমন কথা বলে। মুনাফেকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি হযরত উসামা বিন যায়েদকে বলে যে, তোমাদের মুনিব এবং তাঁর সাথে যারা গিয়েছিল তারা সবাই নিহত হয়েছে। এক ব্যক্তি হযরত আবু লুবাবাকে বলে যে, তোমার সাথিরা এমনভাবে ছত্রভঙ্গ হয়েছে যে, তারা আর কখনোই একত্রিত হবে না আর স্বয়ং মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর শীর্ষস্থানীয় সাহাবীরা শাহাদত বরণ করেছে আর এটি তাঁর উটনী, একে আমরা চিনি। বিরোধীরা বলল, জায়েদ এতটাই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে যে, সে কী বলছে তা নিজেই জানে না আর পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছে। হযরত আবু লুবাবা বললেন, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের কথাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করবেন। ইহুদীরাও একই কথা বলত যে, যায়েদ ব্যর্থ এবং পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছে। হযরত উসামা বিন জায়েদ বলেন, আমি আমার পিতাকে একান্তে জিজ্ঞেস করি যে, আব্বা! আপনি যা বলছেন তা কি সত্য? জায়েদ বলেন যে, হে আমার পুত্র খোদার কসম! আমি যা বলছি তা সত্য। হযরত উসামা বলেন, এতে আমার হৃদয় দৃঢ়তা লাভ করে।

(কিতাবুল মাগাযি, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১১৪, বদরুল কিতাল)

হযরত আবু লুবাবার সরলতা এবং রসূল (সা.)-এর জন্য আত্মনিবেদনের ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, পঞ্চম হিজরীতে মহানবী (সা.) পরিখার যুদ্ধ শেষে শহরে ফিরে এসে অস্ত্রশস্ত্র খুলে রেখে গোসল শেষ করতে না করতেই খোদার পক্ষ থেকে তাঁকে দিব্যদর্শনে বলা হয় বনু কুরাইযার বিদ্রোহ ও বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত তাঁর অস্ত্র খুলে রাখা উচিত নয়। তিনি (সা.) সাহাবীদের মাঝে ঘোষণা করেন যে, তোমরা সবাই বনু কুরাইযার দুর্গ অভিমুখে যাত্রা কর আর আসরের নামাযও সেখানে গিয়েই পড়া হবে। যদিও প্রথম দিকে ইহুদীরা চরম ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতা প্রদর্শন করতে থাকে কিন্তু সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে তারা তাদের অবরোধের কঠোরতা এবং নিজেদের অসহায়ত্ব অনুভব করতে আরম্ভ করে। (মুসলমানরা তাদের দুর্গ অবরোধ করে রেখেছিল।) অবশেষে তারা নিজেদের মাঝে পরামর্শ করে যে এখন করণীয় কি? যাইহোক তাদের মধ্যে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, এমন কোন মুসলমান যে তাদের সাথে সম্পর্ক রাখে আর নিজের সরলতার কারণে তাদের প্রতারণার ফাঁদে পড়তে পারে তাকে তাদের দুর্গে ডাকতে হবে এবং তার কাছ থেকে জানার চেষ্টা করতে হবে যে, তাদের সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর অভিপ্রায় কী? যেন সে অনুসারে তারা পরবর্তী কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে পারে। তাই তারা মহানবী (সা.)-এর কাছে এক দূত পাঠিয়ে প্রস্তাব দেয় যে, আবুল লুবাবা বিন মুনযার আনসারীকে তাদের দুর্গে প্রেরণ করা হোক যেন তারা তার সাথে পরামর্শ করতে পারে। তিনি (সা.) আবু লুবাবাকে অনুমতি দেন। তিনি তাদের দুর্গে প্র বেশ করেন। বনু কুরাইযার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কৌশল ছিল যে, আবু লুবাবা দুর্গে প্রবেশ করতেই সব ইহুদী মহিলা এবং শিশুরা কান্নাকাটি ও আর্তনাদ করতে করতে তার চতুর্দিকে সমবেত হবে আর তার হৃদয়ে তাদের কষ্ট এবং সমস্যার কথা প্রভাব সৃষ্টি করার চেষ্টা করবে। অতএব আবু লুবাবা তাদের ফাঁদে পা দেন। বনু কুরাইযা তাকে এই প্রশ্ন করে যে, হে আবু লুবাবা! তুমি আমাদের কী অবস্থা দেখছো? মুহাম্মদ (সা.)-এর সিদ্ধান্তে আমরা কি আমাদের দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসব? আবু লুবাবা অবলীলায় উত্তর দেন যে, হ্যাঁ, বেরিয়ে আস। কিন্তু একই সাথে নিজের গলায় হাত দিয়ে এমনভাবে ইশারা করেন যার অর্থ মুহাম্মদ (সা.) তোমাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দিবেন। হযরত আবু লুবাবা বলেন, যখন আমি বুঝলাম যে, আমি খোদা এবং তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি (বা যে ইশারা করেছি তা ভুল ভাবে করেছি) তখন আমার হাত ও পা কাঁপতে থাকে। সেখান থেকে তিনি অর্থাৎ আবু লুবাবা মসজিদে নববীতে আসেন এবং মসজিদের একটি স্তম্ভের সাথে নিজেই নিজেকে এই মানসে বেঁধে ফেলেন যে, এটিই আমার শাস্তি। তিনি বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লা আমার তওবা কবুল না করবেন আমি এভাবেই বাঁধা অবস্থায় থাকব। হযরত আবু লুবাবা বলেন, আমার বনু কুরাইযার দুর্গে যাওয়া এবং সেখানে আমি যা কিছু করেছি এর সংবাদ মহানবী (সা.)-এর কাছে পৌঁছালে তিনি (সা.) বলেন যে, তার বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লার সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত তাকে ছেড়ে দাও। সে যদি আমার কাছে আসত তাহলে আমি তার জন্য ক্ষমা চাইতাম। যেহেতু সে আমার কাছে আসে নি আর চলে গেছে তাই তাকে যেতে দাও। হযরত আবু লুবাবা বলেন, আমি ১৫ দিন পর্যন্ত এ পরীক্ষায় নিপতিত থাকি। তিনি বলেন, আমি এক স্বপ্ন দেখেছিলাম আর সেটি আমি স্মরণ করতাম। আমি স্বপ্নে দেখি, আমরা বনু কোরাইযার দুর্গ অবরোধ করে রেখেছি আর এমন মনে হচ্ছিল যেন আমি দুর্গন্ধযুক্ত কাদায় আটকে আছি, সেখান থেকে আমি বের হতে পারছি না আর এর দুর্গন্ধে আমার প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। এরপর আমি একটি বহমান নদী দেখি এবং আরো দেখি যে, তাতে আমি গোসল করছি আর নিজেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করছি। এরপর আমি এক সুগন্ধ পাচ্ছিলাম। তিনি এর ব্যাখ্যা জানার জন্য হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে যান। হযরত আবু বকর (রা.) এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, তুমি এমন বিষয়ের সম্মুখীন হবে যার কারণে তুমি দুঃখ ভারাক্রান্ত হবে, এরপর তা থেকে তোমাকে মুক্তি দেওয়া হবে। হযরত আবু লুবাবা বলেন, আমি বাঁধা অবস্থায় হযরত আবু বকরের কথা স্মরণ করতাম আর আশা করতাম যে, আমার তওবা গ্রহণ করা হবে। হযরত উম্মে সালমা বর্ণনা করেন, আবু লুবাবার তওবা গৃহীত হওয়ার সংবাদ আমার গৃহে অবতীর্ণ হয়, অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর প্রতি এ-সংক্রান্ত ওহী হয়। তিনি বলেন, আমি প্রভাতে মহানবী (সা.) কে মুচকি হাসতে দেখি। আমি নিবেদন করি, খোদা তা'লা আপনাকে সব সময় হাস্যোৎফুল্ল রাখুন, আপনি কেন হাসছেন? মহানবী (সা.) বলেন, আবু লুবাবার তওবা গৃহীত হয়েছে। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূ ল! আমি কি তাকে অবহিত করব? তিনি বলেন, তুমি চাইলে অবহিত কর। হযরত উম্মে সালমা বলেন, আমি কামরার দরজায় দাঁড়িয়ে বলি, (এটি পর্দার নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেকার কথা) হে আবু লুবাবা! আনন্দিত হোন, খোদা আপনার প্রতি কৃপা করে আপনার তওবা গ্রহণ করেছেন, মানুষ ছুটে এসে আবু লুবাবার বাঁধন খোলা আরম্ভ করে। তিনি বলেন, না, মহানবী (সা.)ই আমার বাঁধন খুলবেন। মহানবী (সা.) ফযরের নামায পড়তে মসজিদে গিয়ে স্বীয় পবিত্র হাতে তার বাঁধন খুলে দেন। হযরত আবু লুবাবা মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন যে, আমি আমার পৈত্রিক বাড়ি, যেখানে আমার দ্বারা এই পাপ সংঘঠিত হয়েছে, উৎসর্গ করছি। আমার দ্বারা অনেক বড় ভুল হয়ে গেছে, তাই আমি আমার ঘরবাড়ি পরিত্যাগ করছি আর আমি আমার ধনসম্পদ আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের পথে সদকা করছি। মহানবী (সা.) বলেন, সম্পদের কেবল এক তৃতীয়াংশ সদকা কর। হযরত আবু লুবাবা এক তৃতীয়াংশ সম্পদ সদকা করেন এবং নিজ পৈত্রিক নিবাস পরিত্যাগ করেন।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা: হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ পৃষ্ঠা: ৫৭৭-৫৯৯) (আসাদুল গাবা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৬১-২৬২)

এই বিবরণ ছাড়াও হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, বনু কুরাইযার বিষয়টি নিষ্পত্তি হতে চলেছিল। তাদের বিশ্বাসঘাতকতা উপেক্ষা করার মতো ছিল না। মহানবী (সা.) ফিরে আসতেই সাহাবীদের বলেন, ঘরে বিশ্রাম করো না বরং সূর্যাস্তের পূর্বেই বনু কোরাইযার দুর্গে গিয়ে উপস্থিত হও। পরে তিনি হযরত আলীকে বনু কোরাইযার কাছে প্রেরণ করেন যেন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন যে, কেন তারা এই বিশ্বাসঘাতকতা করেছে (আর মাঝ পথে কেন ছেড়ে চলে এসেছে।) কোথায় বনু কোরাইযা লজ্জিত হবে বা ক্ষমা চাইবে অথবা কোন অজুহাত দেখাবে, তা না করে তারা হযরত আলী এবং তার সাথিদের গালমন্দ করা আরম্ভ করে আর মহানবী (সা.) এবং তাঁর বংশের মহিলাদের গালি দেওয়া আরম্ভ করে আর বলে যে, আমরা জানি না, মুহাম্মদ (সা.) কে বা কী, তাঁর সাথে আমাদের কোন চুক্তি নেই। হযরত আলী তাদের উত্তর নিয়ে ফিরে আসেন। ততক্ষণে মহানবী (সা.) সাহাবীদের সাথে নিয়ে ইহুদীদের দুর্গ অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিলেন। ইহুদীরা যেহেতু নোংরা গালি দিচ্ছিল এবং মহানবী (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রী ও কন্যাদের সম্পর্কে অপলাপ করছিল তাই হযরত আলী চিন্তা করলেন, এসব কথা শুনে রসূলে করীম (সা.) কষ্ট পাবেন, তাই তিনি নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি কেন কষ্ট করছেন, আমরাই এই যুদ্ধ করার জন্য যথেষ্ট, আপনি ফিরে যান। মহানবী (সা.) বলেন, আমি জানি তারা গালি দিচ্ছে আর তুমি চাও না যে, আমার কানে সেই গালি পৌঁছাক। হযরত আলী বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি ঠিকই বলেছেন, বিষয়টি এমনই। মহানবী (সা.) বলেন, তাতে কী, তারা যদি গালি দেয় তাহলে অসুবিধা কী? মূসা (আ.) তাদের নিজস্ব নবী ছিলেন, তাঁকে তারা এর চেয়েও বেশি কষ্ট দিয়েছিল। একথা বলে তিনি ইহুদীদের দুর্গের দিকে এগিয়ে যান কিন্তু ইহুদীরা দরজা বন্ধ করে দুর্গে আবদ্ধ হয়ে থাকে আর মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করে। এমনকি তাদের মহিলারাও যুদ্ধে যোগ দেয়। দুর্গের প্রাচীরের ছায়ায় কিছু মুসলমান বসে ছিল, এক ইহুদী মহিলা ওপর থেকে পাথর ফেলে এক মুসলমানকে হত্যা করে। কিন্তু কিছু দিনের অবরোধের পর ইহুদীরা বুঝতে পারে যে, তারা দীর্ঘ দিন প্রতিরোধ করতে পারবে না। তখন তাদের নেতারা মহানবী (সা.)-এর কাছে এই ইচ্ছা ব্যক্ত করে যে, তিনি যেন আবু লুবাবা আনসারীকে তাদের কাছে প্রেরণ করেন, যিনি তাদের মিত্র আওস গোত্রের নেতা ছিলেন, যেন তারা তাঁর সাথে পরামর্শ করতে পারে। তিনি (সা.) আবু লুবাবাকে পাঠিয়ে দেন। ইহুদীরা তার কাছে পরামর্শ চেয়ে বলে 'সিদ্ধান্ত আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে তোমরা অস্ত্র সমর্পন কর' মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর এই প্রস্তাব কি আমরা মেনে নিব? আবু লুবাবা মুখে হ্যাঁ বললেও নিজের গলায় হাত দিয়ে এমনভাবে ইঙ্গিত করেন যেভাবে হত্যার সংকেত দেওয়া হয়। মহানবী (সা.) তখনো পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন নি কিন্তু আবু লুবাবা ধরে নিয়েছিলেন যে, তাদের অপরাধের শাস্তি হত্যা ছাড়া আর কী হতে পারে? তাই অগ্রপশ্চাত না ভেবে ইশারায় একটি কথা বলে বসেন যা অবশেষে তাদের ধ্বংসের কারণ হয়। যার ফলস্বরূপ ইহুদীরা ধ্বংস হয়। অতএব ইহুদীরা মহানবী (সা.)-এর সাথে সন্ধি করতে অস্বীকৃতি জানায়। তারা যদি মহানবী (সা.)-এর সিদ্ধান্ত মেনে নিত তাহলে অন্যান্য ইহুদী গোত্রের ন্যায় তাদেরকে সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে মদীনা থেকে বহিষ্কারই করা হতো। কিন্তু তাদের দুর্ভাগ্য ছিল, তাই তারা বলে যে, আমরা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সিদ্ধান্ত মানার জন্য প্রস্তুত নই বরং আমরা আমাদের মিত্র গোত্র আওসের সর্দার সাদ বিন মাআয-এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব। তিনি যে সিদ্ধান্ত দিবেন আমরা তা মেনে নিব। কিন্তু তখন ইহুদীদের মাঝে মতভেদ দেখা দেয়। তাদের কতক বলে, আমাদের জাতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আর মুসলমানদের আচরণে প্রমাণিত হয় যে, তাদের ধর্ম সত্য। তাই তারা তাদের ধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। সে জাতির নেতাদের একজন আমর বিন সাদি স্বীয় জাতিকে তিরস্কার করে এবং বলে, অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তোমরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছ, তাই হয় মুসলমান হয়ে যাও অথবা কর দিতে প্রস্তুত হয়ে যাও। ইহুদিরা বলে মুসলমানও হব না আর করও দিব না, এর চেয়ে নিহত হওয়া ভালো। তখন সে তাদেরকে সম্বোধন করে বলে, তোমাদের বিষয়ে আমি দায়মুক্ত। একথা বলেই সে দুর্গ থেকে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হয়। যখন সে দুর্গ থেকে বের হচ্ছিল তখন মুসলমানদের একটি দল তাকে দেখে ফেলে যাদের নেতা ছিলেন মুহাম্মদ বিন মুসলেমা। তিনি বলেন যে, তুমি কে? সে বলে,আমি অমুক। মুহাম্মদ বিন মুসলেমা বলেন, اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنِيْ إِقَالَةَ عَثَرَاتِ الْكِرَامِ অর্থাৎ নিরাপদে চলে যান। এরপর আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ্! ভদ্র লোকদের ভুলভ্রান্তি ঢেকে রাখার মত নেককর্ম থেকে আমাকে কখনো বঞ্চিত করো না। অর্থাৎ এই ব্যক্তি যেহেতু নিজের কর্ম এবং জাতির কর্মের জন্য অনুতপ্ত , তাই আমাদের নৈতিক দায়িত্ব হলো তাকে ক্ষমা করা, তাই আমি তাকে গ্রেপ্তার করি নি এবং যেতে দেয়েছি। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সব সময় এমন নেক কর্মের তৌফিক দিন। মহানবী (সা.) যখন এই ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারেন তখন তিনি মুহাম্মদ বিন মুসলেমাকে ভর্ৎসনা করেন নি যে, কেন এই ইহুদীকে তিনি ছেড়ে দিলেন বরং তিনি (সা.) তার কর্মের জন্য সাধুবাদ জানান। "

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনওয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০,পৃষ্ঠা: ২৮২-২৮৪)

মহানবী (সা.) সম্পর্কে বিভিন্ন অপলাপ করা হয় যে, তিনি নিপীড়ন ও নির্যাতন করেছেন, ইহুদি গোত্রকে হত্যা করেছেন। এরা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংসের জন্য দায়ী ছিল। মহানবী (সা.)-এর হাতে সিদ্ধান্ত করানোর পরিবর্তে তারা তাদের এক সর্দার অর্থাৎ অন্য গোত্রের সর্দার যিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তার হাতে সিদ্ধান্ত করিয়েছে আর তাই তাদের ধর্ম গ্রন্থ অনুসারে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। যাহোক, মহানবী (সা.) এবং সাহাবীদের ওপর এমন কোন আপত্তির সুযোগ নেই যে, তারা কোন প্রকার জুলম বা অন্যায় করেছেন।

আল্লামা ইবনে সাদ লিখেছেন, এক বর্ণনায় আছে যে, কায়েনুকার যুদ্ধ এবং সাভিকের যুদ্ধের সময়ও হযরত আবু লুবাবা মদীনায় মহানবী (সা.)-এর নায়েব হওয়ার সম্মান লাভ করেছেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২২, বাব গাযওয়ায়ে কায়েনুকা ওয়া গাযওয়ায়ে সাভিক, ১৯৯০ সালে বেরুতে দার আহইয়ায়ুত তুরাসুল আরবী দ্বারা প্রকাশিত)

হযরত আবু লুবাবা মক্কা বিজয়ের সময় মহানবী (সা.)-এর সাথে একই বাহনে ছিলেন। আনসার গোত্র আমর বিন আওফের পতাকা তাঁর হাতে ছিল। হযরত আবু লুবাবা মহানবী (সা.)-এর সাথে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৪৯, , ১৯৯০ সালে বেরুতে দার আহইয়ায়ুত তুরাসুল আরবী দ্বারা প্রকাশিত)

তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, কতকের মতে হযরত আবু লুবাবা হযরত আলীর খেলাফতকালে ইন্তেকাল করেন, আবার কেউ কেউ বলেন, হযরত উসমানের শাহাদতের পর তিনি ইন্তেকাল করেন। একটি মতামত হলো পঞ্চাশ হিজরীর পরবর্তী কাল পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন।

(আল আসাবা ফি তামীযিস সাহাবা, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৯০, আবু লুবাবা বিন আব্দুল মুনযার, ১৯৯৫ সালে দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা প্রকাশিত)

সাঈদ বিন মুসাইয়াব বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু লুবাবা বিন আব্দুল মুনযার বলেন, মহানবী (সা.) জুমুআর দিন বৃষ্টির জন্য দোয়া করেন আর বলেন, اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا । অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ কর, হে আল্লাহ্! আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ কর, হে আল্লাহ্! আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ কর। হযরত আবু লুবাবা দণ্ডায়মান হয়ে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! বাগানে ফল ধরেছে। রেওয়ায়েতকারী বর্ণনা করেন যে, আকাশে কোন মেঘ ছিল না তখন মহানবী (সা.) বলেন, হে আল্লাহ্! আমাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণ কর, এমনকি যেন আবু লুবাবাকে খালি গায়ে নিজের গোলার পানির ছিদ্র তার কাপড় দিয়ে বন্ধ করতে হয়। দোয়ার পর আকাশ থেকে বৃষ্টি নেমে আসে। আকাশে মেঘ আসে এবং বৃষ্টি শুরু হয়। মহানবী (সা.) নামায পড়ান। রেওয়ায়েতকারী বর্ণনা করেন যে, আনসাররা হযরত আবু লুবাবার কাছে এসে বলে যে, হে আবুল লুবাবা! আল্লাহ্‌র কসম এই বৃষ্টি ততক্ষণ পর্যন্ত থামবে না যতক্ষণ তুমি মহানবী (সা.)-এর উক্তি অনুসারে খালি গায়ে নিজের গোলা থেকে পানি বের হওয়ার রাস্তা নিজের কাপড় দিয়ে বন্ধ না করবে। তাই হযরত আবু লুবাবা তার কাপড় দ্বারা পানি বের হওয়ার রাস্তা বন্ধ করার জন্য দাঁড়িয়ে যান আর এরপর বৃষ্টি বন্ধ হয়।

(আসসুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫০০, কিতাব সালাতুল ইসতিসকা, বাব ইসতিসকা বিগাইরে সালাত ওয়া ইয়াওমুল জুমা)

হযরত আবু লুবাবা তাঁর দৌহিত্র হযরত আব্দুর রহমান বিন যায়েদকে, যিনি হযরত উমরের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন, একটি খেজুরের পাতায় আবৃত করে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থি ত হন। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, হে আবু লুবাবা! তোমার কাছে এটি কী? হযরত আবু লুবাবা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার দৌহিত্র, আমি এর মত দুর্বল নবজাতক কখনো দেখি নি। মহানবী (সা.) সেই নবজাতককে কোলে নিয়ে তার মাথায় হাত বুলান এবং দোয়া করেন। এই দোয়ার কল্যাণে তাঁর দৌহিত্র আব্দুর রহমান বিন যায়েদ যখন বড় হন তখন মানুষের সাথে এক সারিতে দাঁড়ালে তাকে সবার চেয়ে

লম্বা দেখাত। হযরত উমর নিজের মেয়ে ফাতেমার সাথে তাঁর বিয়ে দেন যিনি উম্মে কুলসুমের গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। উম্মে কুলসুম হযরত আলী এবং ফাতেমার কন্যা ছিলেন।

(ইমতাউল আসমা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৪৬, ফযলু ফি যিকর)

হযরত আনাস বিন মালেক বলেন, মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের মাঝে দুই ব্যক্তির বাড়ি সবচেয়ে দূরে ছিল,একজন হলেন হযরত আবু লুবাবা বিন আব্দুল মুনযার। তার বাড়ি ছিল কুবায়। আরেকজন হলেন হযরত আবু আবাস বিন জাবর। তিনি বনী হারেসায় বসবাস করতেন। তাঁরা উভয়েই আসরের নামায মহানবী (সা.)-এর সাথে পড়ার জন্য আসতেন।

(মুসতাদরিক আলাস সালেহীন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩০৯, কিতাবুস সালাত)

এই ছিল সেই সাহাবীদের জীবনালেখ্য। আল্লাহ্ তা'লা তাদের পদমর্যাদা ক্রমাগতভাবে উন্নীত করুন। জুমুআর নামাযের পর আমি দুজনের জানাযা পড়াব। একটি হলো হাযের জানাযা এবং অপরটি গায়েব।

গায়েবানা জানাযা হলো শহীদ মুকার্‌রম কাজী শাবান আহমদ খান সাহেবের। লাহোরের সাওয়াবা গার্ডেনে তিনি বসবাস করতেন। কাজী শাবান আহমদ খান সাহেব, কাজী মুহাম্মদ সোলেমান সাহেবের পুত্র । তাকে ৪৭ বছর বয়সে ২০১৮ সনের ২৫ জুন তারিখে বিরোধীরা তার ঘরে ঢুকে গুলি করে শহীদ করে। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। বিবরণ অনুসারে ২৫ জুন রাতে মুখোশ পরিহিত দুই বক্তি ঘরে প্রবেশ করে। কাজী সাহেব এবং তার স্ত্রী এক কক্ষে ছিলেন আর তার কন্যারা অন্য কক্ষে ছিল। কাজী সাহেবের স্ত্রী গোসলখানায় ছিলেন, যখন তিনি সেখান থেকে বের হন তখন বাইরে দুজন মুখোশধারী ব্যক্তি ছিল। মুখোশধারী ব্যক্তিদের একজন কাজী সাহেবের স্ত্রীর মাথায় পিস্তল ধরে আর তাকে অন্য কক্ষে নিয়ে যায় যেখানে তার মেয়েরা ছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি কাজী সাহেবের কক্ষেই ছিল, সে কাজী সাহেবের পেটে তিনবার গুলি করে যার ফলে ঘটনাস্থলেই তিনি শাহাদত বরণ করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

শহীদ মরহুম ২০০১ সনে তাঁর এক বন্ধু মুহাম্মদ ইকবাল সাহেবের মাধ্যমে সপরিবারে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। কাজী সাহেব কাশ্মীরের মুজাফ্‌ফরাবাদের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ২০০১ সনে লাহোরের সোওয়াবা গার্ডেনের নিশতার কলোনীতে স্থানান্তরিত হন। এর কিছুকাল পূর্বে লাহোরের টাউনশিপেও তিনি বসবাস করেন। কাজী শাবান সাহেব প্রতিবন্ধী শিশুদের স্কুল চালাতেন। তাঁর ঘর ছিল স্কুলের ওপরের তলায়। আজকাল ঘরের নিচের তলায় স্কুলের নির্মাণ কাজ চলছিল। সাটারিং এর কাজ চলছিল আর এই সাটারিং-এ মুখোশধারী এই ব্যক্তিরা এসে আত্মগোপন করে থাকে, আর পরে সুযোগ পেয়ে আক্রমণ করে।

শহীদ মরহুম বহু গুণের অধিকারী ছিলেন। বয়আতের পর কাজী সাহেব খুবই নিষ্ঠাবান এবং পুণ্যবান প্রমাণিত হন। খিলাফতের প্রতি অগাধ ভালোবাসা এবং গভীর সম্পর্ক ছিল। শহীদ মরহুম ঘরে এম.টি.এ দেখার জন্য ডিস এন্টেনা লাগিয়ে রেখেছিলেন যেন নিজেকে এবং পরিবার পরিজনকেও খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত রাখতে পারেন। বিভিন্ন চাঁদা এবং অন্যান্য আর্থিক কুরবানীতে তিনি উৎসাহের সাথে অংশ নিতেন। হালকা প্রেসিডেন্টের আমেলায় অডিও-ভিডিও-এর সেক্রেটারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। মানুষের ডিস এন্টেনাও বিনামূল্যে ঠিক করে দিতেন। কাজী সাহেবের বিয়ে তার তুতো বোনের সাথে হয়। উভয় পরিবারে শুধুমাত্র তার স্ত্রী, তিনি এবং তার সন্তান-সন্ততিরা আহমদী ছিল। পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা তার আহমদীয়াত গ্রহণের কারণে তার বিরোধী হয়ে যায়। কয়েক মাস পূর্বে কাজী সাহেবের শ্যালক তাদের বাড়িতে এসে বলে, আমরা জানতে পেরেছি যে, তোমরা মির্যায়ী হয়ে গেছো, এরই ফাঁকে তার চোখ ছাদের ডিস এন্টিনার ওপর পড়ে আর সে সেটি ভাঙতে আরম্ভ করে। কাজী সাহেব বাধা দিলে তাদের মাঝে কথা কাটাকাটিও হয়। যাহোক, তাঁর শ্যালক নিজের বোনকে বলে যে, তোমার বিয়ে ভেঙ্গে গেছে, তাই আমার সাথে চল কেননা তোমার স্বামী মির্যায়ী হয়ে গেছে। এতে কাজী সাহেবের স্ত্রী তার ভাইকে বলেন, আমি নিজেও আহমদী এবং মুসলমানও আর কাজী সাহেবকেও আমি মুসলমান মনে করি। আমি তোমার সাথে কোথাও যাব না। মরহুমের স্ত্রী বলেন, বিরোধীদের পক্ষ থেকে শহীদ মরহুমকে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল, যে কারণে তিনি খুবই চিন্তিত ছিলেন আর কিছু দিন ধরে নীরব ছিলেন, ঘর থেকে কমই বাইরে বের হতেন। মরহুম কাজী সাহেব তার স্ত্রীকে বলেছিলেন, আমার যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে সর্বপ্রথম হালকার প্রেসিডেন্ট সাহেবকে অবহিত করবে। সুতরাং শাহাদতের ঘটনার পর তিনি তা-ই করেছেন আর জামা'তের কর্মকর্তাদের অবহিত করেন। তিনি পরম অবিচলতা প্রদর্শন করেন, যদিও তার গয়ের আহমদী আত্মীয়স্বজনও এসেছিলো কিন্তু মরহুমের স্ত্রী স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যে, আহমদীরাই জানাযার নামায পড়বে আর আহমদীরাই দাফন করবে। কাজী সাহেবের ইন্তেকালের খবর পেয়ে ক'জন অ-আহমদী আত্মীয় বায়তুন নূর মসজিদেও এসেছিল, তবে তারা জানাযার নামাযে অংশ নেয় নি। মরহুমের স্ত্রী এবং কন্যারাও মৃতদেহের সাথে কবরস্থান পর্যন্ত যায়।

শহীদ মরহুম শোক সন্তপ্ত পরিবারে রেখে গেছেন তাঁর ৪০ বছর বয়স্কা স্ত্রী শ্রদ্ধেয়া শেহনাজ শাবান সাহেবা, কন্যা আজিজা কিরণ (বয়স ১৯ বছর), সিদরা শাবান, (বয়স ১৮) এবং মালায়েকাকে (বয়স ১১)। এই তিন কন্যাও পোলিওর কারণে আংশিক প্রতিবন্ধী। খোদা তা'লা তাদের সকলের তত্ত্বাবধান করুন এবং সকল দুশ্চিন্তা থেকে তাদেরকে নিরাপদ রাখুন আর কাজী সাহেবের পদমর্যাদা উত্তরোত্তর উন্নীত করুন।

দ্বিতীয়টি হাজের জানাযা। এটি শ্রদ্ধেয়া আমাতুল হাই বেগম সাহেবার জানাযা। তার পিতার নাম শেঠ মোহাম্মদ গওস সাহেব, গত ২৩ শে জুন একশত বছরের অধিক বয়সে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তার পিতা শেঠ মোহাম্মদ গওস সাহেবের দু'টো বিশেষত্ব ছিল, একটি হল- যদিও তিনি সাহাবী ছিলেন না তথাপি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তাকে কাদিয়ানের বেহেশতী মকবারায় সাহাবীদের জন্য নির্ধারিত বিশেষ স্থানে দাফনের অনুমতি দেন।

(আহমদীয়াতের ইতিহাস, খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা: ২১১)

আর দ্বিতীয় বিশেষত্ব হলো- 'আসহাবে আহমদ' বইতে লেখা আছে যে, শেঠ মোহাম্মদ গওস গত ৪২ বছরে সেই প্রথম সৌভাগ্যবান ব্যক্তি, যার জানাযা আজ ঠিক সেই জায়গায় এবং সেই হালকায় পড়া হচ্ছে যেখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর পবিত্র দেহ রাখা হয়েছিল। তখন হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানি সাহেব একটি স্টুল বা চেয়ারে দাঁড়িয়ে গগনচুম্বি কণ্ঠে এর সাক্ষ্যও দিয়েছিলেন।

(আসহাবে আহমদ, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৬৮-২৬৯, সীরাত হযরত ভাই আব্দুর রহমান সাহেব কাদিয়ানী)

আমাতুল হাই সাহেবের বিয়ের সময় যদিও তাঁর পিতা জীবিত ছিলেন কিন্তু হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তার পিতার বাসনায় স্বয়ং তার ওলীর দায়িত্ব পালন করেন এবং বিয়ে পড়ান, বিয়ের খুতবায় তিনি বলেন, শেঠ সাহেবের কনিষ্ঠা কন্যা আমাতুল হাইয়ের নিকাহ্‌র ঘোষণা এখন দিচ্ছি যা খান সাহেব ডা. মুহাম্মদ আব্দল্লাহ্ সাহেবের নিকটাত্মীয় ও সম্ভবত ভাতিজা মোহাম্মদ ইউনুস সাহেবের সাথে নির্ধারিত হয়েছে। এই বিয়েতেও শেঠ সাহেব নিষ্ঠাকে সামনে রেখেছেন। সাংস্কৃতিক বিভিন্ন পার্থক্যের কারণে আমি তাকে লিখতাম যে, হায়দারাবাদেই বিয়ে দেন কিন্তু তার বাসনা ছিল যে, কাদিয়ান বা পাঞ্জাবে বিয়ে হোক, যেন তাঁর হৃদয়ে কাদিয়ান আসার আরেকটি প্রেরণা জাগে। মোহাম্মদ ইউনুস সাহেব কারনাল জেলার অধিবাসী যা দিল্লির পাশে অবস্থিত, কিন্তু হায়দারাবাদের তুলনায় কাদিয়ানের অনেক নিকটবর্তী। শেঠ সাহেবের পরিবার এক নিষ্ঠাবান পরিবার। তাদের মহিলাদের আমাদের বংশের মহিলাদের সাথে, তাদের মেয়েদের আমার মেয়েদের সাথে এবং তার ছেলেদের সাথে আমার এমন নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে যেন একই পরিবার। তিনি আমাদের সাথে আর আমরা তার সাথে খোলামেলা আচরণ করি। পরস্পরের সুখ-দুঃখকে আমরা সেভাবে অনুভব করি, যেভাবে নিজের পরিবারের দুঃখ বেদনাকে অনুভব করি। তার মেয়ে আমাতুল হাই-এর বিয়ে কর্নাল জেলার লাডোয়ার অধিবাসী আব্দুল আজিজ সাহেব এর পুত্র মুহাম্মদ ইউনুস সাহেবের সাথে এক হাজার রুপিয়া মোহরানায় নির্ধারিত হয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, শেঠ সাহেব মেয়ের পক্ষ থেকে আমাকে ওলী নিযুক্ত করেছেন।

[খুতবাতে মাহমুদ (খুতবাতে নিকাহ), ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫৫৩]

আমাতুল হাই সাহেবা নামায ও রোযায় নিয়মানুবর্তী ছিলেন। দোয়াগো ছিলেন, খিলাফতের সাথে গভীর নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা রাখতেন। আমার সাথেও সাক্ষাৎ করতে আসতেন। যদিও একান্ত বয়োঃবৃদ্ধা ছিলেন, কিন্তু এখানে আসতেন। গভীর নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা প্রদর্শন করতেন। খুবই পুণ্যবতী ছিলেন। তিনি ওসীয়্যত করেছিলেন। দুই পুত্র ও দুই কন্যা এবং বহু পৌত্র পৌত্রি, দৈহিত্র, দৈহিত্রী রেখে গেছেন। তিনি জার্মানির মুহাম্মদ ইদ্রিস হায়দারাবাদি সাহেবের মাতা ছিলেন। তার এক পৌত্র মুসাওয়ার সাহেবও এখানে খোদ্দামুল আহমদীয়ায় কাজ করেন।

আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পদমর্যাদা উন্নীত করুন আর তার বংশকেও খেলাফতের সাথে সত্যিকার এবং নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার তৌফিক দিন। (আমীন)

*****❖*****❖*****❖*****

২ পাতার পর...

খলীফা ইসলামের প্রকৃত চিত্র উপস্থাপন করেছেন। শরণার্থী সমস্যা প্রসঙ্গে তিনি গভীর বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি রাখেন। তাঁর এই কথা পুরোপুরি ঠিক যে, উভয় পক্ষকে একে অপরের প্রতি সম্মান জানানো উচিত। আমি বৈচিত্রতার বিষয়ে বক্তব্য রেখে থাকি এবং অনেক মানুষের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়, আমি মনে করি যে, আপনাদের খলীফা মুসলমানদের জন্য একজন আদর্শ। খলীফা তাঁর সমস্ত বক্তব্য কুরআনের উদ্ধৃতি সহকারে উপস্থাপন করছিলেন। এই বিষয়টি বেশ চমৎকার ছিল। খলীফা জাতিসংঘের আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কে উল্লেখ করেন। আমার অনেক নিকট বন্ধু ইসলাম সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত রয়েছে। এখন আমি এখান থেকে গিয়ে তাদের সম্মুখে ইসলামের স্বরূপ উপস্থাপন করব এবং বলব যে ইসলাম সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। আমাকে এই ভাষণের ইউটিউব লিঙ্ক পাঠিয়ে দিন, আমি আমার সমস্ত বন্ধুদের কাছে পৌঁছিয়ে দিব।

একজন অতিথি মি. স্টিগ নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন: এটি একটি চমৎকার ভাষণ ছিল। আমি এর পূর্বে কখনো কাউকে ইসলাম সম্পর্কে এমন ভঙ্গিতে কথা বলতে দেখি নি। খলীফা বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যার উল্লেখ করেছেন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করার উপদেশ দিয়েছেন। বর্তমানেও এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্যও এই বার্তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। খলীফা অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণভাবে শান্তির কথা বলছিলেন। আমি তাঁকে অনেক শ্রদ্ধা করি।

* মিসেস সিবিল্লা নামে একজন মহিলা নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: খলীফা যে বাণী দিয়েছেন এটিই হল সেই প্রকৃত বাণী যা প্রত্যেক ধর্ম নিজেদের সূচনাতে দিয়েছিল। এটিই প্রত্যেক ধর্মের মৌলিক শিক্ষা । খলীফা সকলকে একটি বিষয়ের দিকে আহ্বান করছেন। তাঁর কথা শুনে আমার মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে যে, পৃথিবীর সমস্যাবলীর কারণ ধর্ম নয়। যদি মুসলমানদের সাথে আমাদের মতভেদ থাকে তবে তা ধর্মীয় না বরং সাংস্কৃতিক। খলীফা অত্যন্ত সরল ভাষায় বার্তা দিচ্ছেন যে, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হও এবং পারস্পরিক ভেদাভেদ থেকে বিরত থাক। শান্তির জন্য খলীফার প্রচেষ্টাকে আমি অত্যন্ত সম্মানের দৃষ্টিতে দেখি।

আজকের পূর্বে ইসলাম সম্পর্কে কিছু জানা ছিল, আজকে আমি অনেক কিছু জানতে পারলাম। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, কুরআন পড়ার চেষ্টা করব। ভবিষ্যতের বিষয়ে খলীফা আমার মধ্যে এক নতুন আশার সঞ্চার করেছেন।

* গোরাম নামে একজন অতিথি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: খলীফার ভাষণ চমৎকার ছিল। এত সংখ্যক পার্লামেন্টের সদস্য দেখে আমি বিস্মিত হই। এটি প্রমাণ করছে যে, পার্লামেন্টের এই সকল সদস্যগণ তাঁকে এবং তাঁর আন্দোলনকে সমর্থন করছে। খলীফাকে দেখা এবং শান্তির বাণী শোনা সুখকর অনুভুতি ছিল। খলীফার বাণী বর্তমান সময়ের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন। খলীফাকে দেখে বোঝা যায় যে, তিনি অত্যন্ত দয়ালু প্রকৃতির এবং আধ্যাত্মিক ব্যক্তি। খলীফা যা কিছু বলেছেন কুরানের আয়াতের আলোকে বলেছেন। যেটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি যা কিছু বলছেন তা ইসলামী শিক্ষার অনুরূপ। কুরআনের শব্দগুলি নিজের মধ্যে প্রবল আকর্ষণ রাখে।

আমি আশ্চর্যান্বিত ছিলাম যে, তিনি শরণার্থী সংকটের বিষয়ে এতকিছু বললেন। কেননা অধিকাংশ ধর্মীয় নেতাগণ এই প্রসঙ্গটি এড়িয়ে চলেন। আমি এই বিষয়ে অবহিত ছিলাম না যে, কোন মহিলাকে হাসপাতালে চিকিৎসা থেকে বাধা দেওয়া হয়েছে। এর থেকে তাঁর জ্ঞানের ব্যপকতা প্রমাণিত হয় এবং একথা প্রমাণ করে যে তিনি আমাদের প্রতি কতটা যত্নবান।

খলীফা বলেছেন যে, যদি শরণার্থীরা নিজেদের দায়িত্ব পালন না করে তবে এর অশুভ পরিণাম প্রকাশ পাবে। খলীফা বিশ্বকে সংঘর্ষ থেকে রক্ষা করতে চান। এটি একটি প্রশংসনীয় কাজ। তিনি আমাদেরকে সর্তক করেছেন যে, যদি উভয় পক্ষই শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নিজেদের দায়িত্ব পালন না করে তবে ধারাবাহিক বিপর্যয় আরম্ভ হতে পারে।

আমি একথাও বলতে চাই যে, আপনাদের নেতা একজন সুবক্তা। তাঁর বাচনভঙ্গি আমার মনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। আপনারা তাঁকে হুযুর বলেন, আমি কিন্তু তাঁকে বাদশাহ বলে সম্বোধন করতে চাইব।

* গুন্নার হেন্ড্রিকসন নামে একজন অতিথি নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে বলেন: খুব সুন্দর অনুষ্ঠান ছিল। খলীফা শরণার্থী সংকট সম্পর্কে যে বিশ্লেষণ দিয়েছেন তা চমৎকার ছিল। খলীফা অত্যন্ত প্রজ্ঞপূর্ণ কথা বলেন। তিনি সত্য কথা বর্ণনা করেন। আমার ইচ্ছা, সমস্ত মুসলমানদের যদি খলীফার মত একজন নেতা থাকত যিনি তাদেরকে শান্তি ও সত্যের দিকে আহ্বান করতেন। কেবল একটি প্রশ্ন করতে চাই যে, আপনাদের মহিলারা কোথায়?

* একজন পুলিশ অফিসার যার নাম হল আ্যারোন, তিনিও এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজের অভিমত প্রকাশ করে বলেন: খলীফার ভাষণ প্রভাব ফেলেছে। খলীফা সঠিক কথা বলেছেন যে, আমরা সুইডেনেও এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছি এবং নিরাপদ নই। আমি আজ পর্যন্ত যতগুলি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছি সেগুলির মধ্যে এই অনুষ্ঠানটি সবথেকে বেশি শান্তিপূর্ণ ছিল। ইসলামী নেতার শান্তির বাণী শোনার জন্য বিভিন্ন পেশার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত মানুষ এখানে একত্রিত হয়েছিল। এখানে আসা সম্মানের বিষয় কেননা, তিনি অবশ্যই একজন মহান নেতা।

খলীফা বলেছিলেন যে, আমাদেরকে পারস্পরিক ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যমত গড়ে তুলে সমস্যার সমাধান করতে হবে। শরণার্থী সংকট একটি অনেক তীব্র সংকট। খলীফা আমাদেরকে এই সম্পর্কে বলেছেন যে, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বজায় রেখে এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। নিশ্চিতরূপে আজ আমি ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু শিখলাম।

পার্লামেন্টের সদস্য মি. ওয়াল্টার নিজের অভিমত প্রকাশ করে বলেন: শরণার্থী সংকট প্রসঙ্গে খলীফার বিশ্লেষণ আমার খুব ভাল লেগেছে। এটি বর্তমান সময়ের বিষয়। খলীফার চিন্তাধারা সম্পর্কেও আমরা অবগত হলাম, এটি আমাদের জন্য মঙ্গলজনক। খলীফা বলেছেন উভয় পক্ষেরই দায়িত্ব হল নিজেদের আসল প্রতিশ্রুতি ও আবশ্যিক করণীয়গুলি পালন করা। খলীফা যেখানেই যান শান্তির প্রসার করেন।

পার্লামেন্টের সদস্য মি. বেং নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: এটি আমাদের জন্য অনেক গর্বের বিষয় যে, পৃথিবীর একজন মহান নেতা সুইডেনে পদার্পণ করেছেন।

তিনি হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণের উল্লেখ করে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: এটি ছিল এক মহান ব্যক্তির মহান ভাষণ। বিশ্ব-নেতাদের উচিত শান্তির জন্য চেষ্টা করা এবং নিজেদের জাতিকে ভালবাসার তির দ্বারা বিদ্ধ করা। খলীফার এই বাণী কেবল সুইডেনের জন্যই নয়, বরং পুরো ইউরোপ ও বিশ্বের জন্য। খলীফা শরণার্থীদেরকেও স্মরণ করিয়েছেন যে, তারা যেন স্থানীয় সমাজের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। হুযুর নিশ্চিতভাবে আমাকে এবং আমার পার্লামেন্টের সঙ্গীদের অনেক কিছু ভাবতে বাধ্য করেছেন।

* জর্গান কার্লসন নামে একজন পুলিশ অফিসার নিজের অভিমত প্রকাশ করে বলেন: অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে আমি নিরাপত্তার বিষয়ে উদ্বিগ্ন ছিলাম। কিন্তু এখানে এসে আমি দেখলাম খুব ভাল ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তিনি বলেন: খলীফার এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা আমার জন্য বিরাট সম্মানের বিষয়। এই সংকটময় যুগের প্রেক্ষিতে খলীফার বাণী অনেক গুরুত্ববহ। যুগ খলীফার মত একজন ব্যক্তিত্ব আমাদের মাঝে বিরাজ করবেন যিনি মানবীয় সহানুভুতির গুরুত্ব উপলব্ধি করাবেন, এই বিষয়টির একান্ত প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

* একজন অতিথি নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন: খলীফার ভাষণ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ছিল। মন চাইছিল যে, এই ভাষণ যেন শেষই না হয়।

* অনুরূপভাবে একজন সুইডিশ ভদ্রমহিলা মিস আন্না সাহেবা তাঁর অভিমত প্রকাশ করে বলেন: অনেকেই সত্যবাদী হওয়ার দাবী করে, কিন্তু আপনার কাছে তখনই সত্য উদ্ঘাটিত হয় যখন আপনি তার কথা শুনেন। আজ সন্ধ্যায় আমি কেবল সত্য কথাই শুনেছি।

* একজন অতিথি নিজের অভিমত প্রকাশ করে বলেন: শান্তি প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে কথা শুনে খুব ভাল লাগল। বিশেষ করে একজন মুসলমান নেতার পক্ষ থেকে শান্তির বার্তা শুনে খুব ভাল লাগল। আমার ইচ্ছা, সমস্ত মুসলমানদের চিন্তাধারা আহমদী মুসলামানদের ন্যায় হয়ে যাক। আমি আশা করি এইভাবে মধ্য-প্রাচ্যে এবং অবশিষ্ট বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী একজন সুইডিশ অতিথি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: আমার মতে খলীফা তাঁর বক্তব্য অনেক চিন্তা-ভাবনা করে এবং পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে লিখেছিলেন। কেননা, তিনি সুইডেনের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি

ইমামের বাণী

"তোমাদের উচিত, তোমরাও সহানুভূতি ও চিত্তশুদ্ধি দ্বারা রূহুল কুদুস থেকে অংশ লাভ কর, কারণ রূহুল কুদুস ছাড়া প্রকৃত তাকওয়া লাভ হতে পারে না।" (আল-ওসীয়্যত, পৃষ্ঠা: ১৮)

দোয়াপ্রার্থী: আবুল হাসানাত, নারগিস সুলতানা, মুশতাক আহমদ,ইমতিয়ায আহমদ, জামাত আহমদীয়া ব্যাঙ্গালোর (কর্ণাটক)

সম্পর্কেও ভালভাবে অবগত ছিলেন। এখানে সুইডেনে বিদ্যমান শরণার্থী সংকট সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। খলীফা বলেছেন যে, শরণার্থীদের উপরও কিছু দায়িত্ব বর্তায়। এটি এমন একটি বিষয় যা সুইডিশ রাজনীতিকরা কখনো উচ্চারণ করেন না।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী আরেক অতিথি বলেন: এই অনুষ্ঠান আমার জন্য অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও জীবনদায়ী প্রমাণিত হয়েছে। আপনাদের ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। আমার মতে আপনরা যদি খলীফাকে অনুসরণ করে চলেন তবে পৃথিবীর পরিস্থিতি বদলে যাবে।

এক সুইডিশ ভদ্রমহিলা নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: আজকের অনুষ্ঠান প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষকে সমাবিষ্ট করেছে আর আজ আমি অনেক কিছু শিখেছি। খলীফার ভাষণ আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। বরং আমি বলব খলীফার ভাষণ অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক ছিল। আমি কৃতজ্ঞ যে, খলীফা আমাদের দেশে এসেছেন এবং সুইডেনের সমস্যাবলী সমাধানের বিষয়ে পথ-প্রদর্শন করেছেন। আমি আনন্দিত যে, তিনি আমাদেরকে কেবল বিপদের বার্তাই দেন নি, বরং আমাদেরকে সতর্কও করেছেন এবং আমাদের চোখ খুলে দিয়েছেন। সন্দেহ নেই, এটি এক অসাধারণ ভাষণ ছিল।

আরেক সুইডিশ অতিথি বলেন: বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে একত্রিত করা একটি বিরাট উদ্দেশ্য, কেননা, অনেক অশুভ শক্তি মানুষের মাঝে বিভেদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টায় রত রয়েছে। আমার মতে আপনারা সফল হয়েছেন। কেননা, খলীফার সঙ্গে সাক্ষাত করে, তাঁর ভাষণ শুনে আমাদের চোখ খুলে গেছে। আমরা অনেক নতুন বিষয় শিখেছি। এখন আমরা বিদ্বেষ দূর করব, কেননা, বর্তমানে ইসলাম সম্পর্কে খুব বেশি বিদ্বেষ রয়েছে। অনেকে জানেই না যে, জামাত আহমদীয়া মুসলেমা কোন্ মূল্যবোধের প্রতিনিধিত্ব করে। তাই জামাত আহমদীয়ার সঙ্গে সাক্ষাত করেই আপনি জানতে পারবেন যে, আপনারা শান্তি ও সমন্বয়ের বাণীর প্রসার করতে পারেন।

এক সুইডিশ অতিথি বলেন: অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে এবং খলীফার সঙ্গে সাক্ষাত করে আনন্দিত হয়েছি। খলীফা এমন বিষয়াবলীর উপর কথা বলেছেন যেগুলি নিয়ে কথা বলতে অন্যান্য ধর্মীয় নেতারা ভয় পায়। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, যারা সুইডেনে আশ্রয় নিয়েছে তাদের কাছ থেকে কি প্রত্যাশা করা হয়।

কয়েকজন অধ্যাপকের সঙ্গে হুযুর আনোয়ারের সাক্ষাত

সাক্ষাতের শুরুতে সেখানে উপস্থিত প্রফেসরগণ নিজেদের পরিচয় জ্ঞাপন করেন। সর্বপ্রথম সুইডেনের এক প্রফেসর নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন, তিনি মধ্যপ্রাচ্যে দীর্ঘদিন ছিলেন।

এরপর এক মহিলা নিজের পরিচয় জ্ঞাপনের পর বলেন, তিনি তেলআবিবের (ইজরাইল) অধিবাসী , কিন্তু গত কুড়ি বছর থেকে সুইডেনে বসবাস করছেন।

এরপর এক প্রফেসর ডক্টর নিজের পরিচয় জ্ঞাপনের পর বলেন, বর্তমানে আমি ইহুদী কমিউনিটির জন্য কাজ করছি। আমি 'খাতনা'-ও করি, কিন্তু যারা আমাদের কাছে আসে তাদের মধ্যে অধিকাংশ মুসলমান। এই কারণে আমি মুসলমানদেরকে খুব কাছে থেকে চিনি।

এরপর এক সহকারি অধ্যাপিকা নিজের পরিচয় জ্ঞাপন করে বলেন, আমি সুইডেনের একটি ইউনিভার্সিটিতে ধর্মতত্ত্ব পড়াই। এছাড়াও ইংল্যান্ডের ওয়ারউইক ইউনিভার্সিটিতেও অধ্যাপনা করি। এর পাশাপাশি ইসলামিক এজুকেশনের উপরও গবেষণা করছি।

এরপর আরেক অধ্যাপক নিজের পরিচয় জ্ঞাপনের পর বলেন, আমার বিষয় হল পারস্যের ইতিহাস এবং শিয়া ধর্মমত।

ইউনিভার্সিটি অফ স্টকহোম -এর এক অধ্যাপক বলেন, তিনি ধর্মীয় ইতিহাস পড়ান। তিনি ইসলাম এবং মিডল ইস্টার্ন স্টাডিজ বিষয়ক স্কলার।

এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় পর্বের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) জিজ্ঞাসা করেন, এর মানে আজকে সবাই অধ্যাপকগণ এসেছেন। একথা শুনে এক অতিথি বলেন, তিনি ছাড়া সকলেই অধ্যাপক আর তিনি সুইডেনের এক চার্চে পাদ্রীর পদে রয়েছেন। তিনি বলেন, আমি তিন বছর মিশরে থেকে এসেছি।

এছাড়াও তাঁদের মধ্যে ছিলেন সুইডেনে নিযুক্ত ভারত ও ইসরাঈলের রাষ্ট্রদূত।

হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন, সুইডেন মানুষের জীবনযাপন কেমন? এর উত্তরে এক অধ্যাপিকা বলেন, আমার মতে সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বর্তমান যুগে যেভাবে কিছু কিছু পরিবর্তন আসছে তা ইউরোপের মত সুইডেনকেও প্রভাবিত করছে। আর ব্যক্তিপর্যায়ে দেখতে গেলে আপনি যদি সঠিকপথে থাকেন তবে সুইডেনে জীবনধারণ খুবই সহজ।

হুযুর আনোয়ারের প্রশ্নের উত্তরে এক অধ্যাপক বলেন, সুইডেনে ইহুদীদের মোট জনসংখ্যা প্রায় কুড়ি হাজার এবং তাদের মধ্যে অর্ধেক গ্রেটার স্টকহোমেই বসবাস করেন। এছাড়াও ইহুদী কমিউনিটি গোথেনবার্গ এবং মালমো অঞ্চলে বসবাস করে। কিন্তু সব থেকে বেশি ইহুদী বাস করে স্টকহোমে।

এরপর একজন অধ্যাপক হুযুর আনোয়ারকে প্রশ্ন করেন যে, সুইডেনে আপনার সময় কেমন কাটল?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: গত কয়দিনে ব্যস্ততা বেশি ছিল। জামাতের অনেক সদস্য সাক্ষাতের জন্য আসতে থাকে। কিছু অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। মালমোতে মসজিদ উদ্বোধন হয়েছে।

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কি গোথানবার্গে গিয়েছেন?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: এই সফরে এখনও গোথানবার্গ যাই নি। কিন্তু স্টকহোম থেকে গোথানবার্গ যাওয়ারই পরিকল্পনা আছে। এগারো বছর পূর্বে যখন সুইডেন আসি, সেই সময় গোথানবার্গও এসেছিলাম। যাইহোক স্টকহোম প্রথম বার এলাম।

এক অধ্যাপক প্রশ্ন করেন, সুইডেনে কি জামাত আহমদীয়ার সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: একথা বলা যাবে না যে, সংখ্যা খুব বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু পর্যায়ক্রমে উন্নতি তো অবশ্যই হচ্ছে। সম্প্রতি পাকিস্তানের কিছু শরণার্থী এখানে বসবাস করতে শুরু করেছে যাদেরকে UNHCR-এরমাধ্যমে মালেয়েশিয়া, থাইল্যান্ড ইত্যাদি সুদূর প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশগুলিতে শরণার্থীর মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল।

এক অধ্যাপিকা প্রশ্ন করেন যে, যুক্তরাজ্যে আপনাদের জামাত কতবড়? শুনেছি সেখানেও সমগ্র দেশে আপনাদের মসজিদ রয়েছে?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: সেখানে প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার আহমদী রয়েছেন যাদের অধিকাংশই লন্ডনে থাকেন। কিন্তু গোটা দেশেই আহমদীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। অনুরূপভাবে সেখানে প্রায় প্রত্যেকটি শহরেই আমাদের মসজিদ ও সেন্টার প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। যুক্তরাজ্যে প্রায় প্রতি দুই বছরে দুই থেকে তিনটি করে মসজিদ নির্মিত হচ্ছে।

আরেক অধ্যাপক প্রশ্ন করেন যে, শিয়াদের বিরুদ্ধে যে বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে সে সম্পর্কে আপনার মতামত কি? আর যেভাবে শিয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাচ্ছে তার সঙ্গে আহমদীদের কি কোন সম্পর্ক রয়েছে?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: মুসলমানদের অধিকাংশ সুন্নী সম্প্রদায়ের। যদিও সুন্নীদের মধ্যে অনেকগুলি সম্প্রদায় রয়েছে। কিন্তু এদের সকলের দাবি, শিয়ারা মূল শিক্ষা থেকে দূরে সরে গেছে এবং সঠিক ইসলামী শিক্ষার উপর আমল করে না। আমাদের সম্পর্কেও তাদের একই চিন্তাধারা। শিয়াদের নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস রয়েছে যা তারা কয়েক শতাব্দী থেকে মেনে আসছে। অপরদিকে আমাদের বিশ্বাস, রসুলে করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে শেষ যুগে ইসলামকে সঞ্জিবীত করতে এক ব্যক্তির দ্বিতীয়বার আবির্ভূত হওয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল। রসুলে করীম (সা.) এমন ব্যক্তিকে মসীহ ও মাহদী নামে অভিহিত করেছেন। অতএব আমাদের বিশ্বাস, সেই ব্যক্তি এসে গেছেন আর তিনি নবীর মর্যাদা রাখেন। আমাদের বিরোধীদের অধিকাংশই বিভিন্ন সুন্নী সম্প্রদায়ের। কিন্তু শিয়া ও সুন্নী উভয়েই আমাদের বিরুদ্ধে। কেননা, এদের ধারণা, ইসলামের পয়গাম্বার (সা.)-এর পর কোন নবী আসতে পারে না। আর এই কারণেই এরা আমাদের বিরোধী। কিন্তু আমরা দলিল দিই যে, রসুলে করীম (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং কয়েকটি নিদর্শনাবলীও বর্ণনা করেছিলেন। তাই আপনারা যে জামাত আহমদীয়ার কথা বলেন বা প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীর কথা বলেন-এর ভবিষ্যদ্বাণী পয়গাম্বার (সা.) পূর্বেই করে রেখেছেন। আমরা যদি এই ধর্মবিশ্বাসের উপর ঈমান এনে থাকি তবে তার পিছনে রয়েছে মজবুত দলিল। যাইহোক আমাদের এবং অন্যান্য মুসলমানদের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে মতভেদ রয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাসত্ত্বেও সারা পৃথিবী থেকে সুন্নী মুসলমান এবং শিয়া মুসলমান জামাত আহমদীয়ার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন।

এই উত্তর শুনে এক অধ্যাপিকা বলেন: সুন্নী ও শিয়াদের মধ্য থেকে যারা আপনাদের দলভুক্ত হচ্ছেন তাদের সম্পর্ক কি সুন্নী এবং শিয়াদের বিশেষ কোন চিন্তাধারার মানুষের সঙ্গে?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: সুন্নী এবং শিয়াদের মধ্য থেকে কোন বিশেষ চিন্তাধারার মানুষেরা আমাদের জামাতের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন না। বরং, বিভিন্ন চিন্তাধারার মানুষ আমাদের জামাতের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন। যারাই আমাদের দলিল এবং ধর্মমত বুঝে নেয় তারাই

আমাদের অন্তর্ভুক্ত হন।

সেই ভদ্রমহিলা বলেন: আপনার জামাতে সামিল হওয়ার পদ্ধতি কি?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: পদ্ধতি হল জামাত আহমদীয়ায় প্রবেশকারী বয়াত (দীক্ষা) নেয়। এবং এই মর্মে অঙ্গিকার করে যে, আমি মসীহ মওউদ (আ.)-এর উপর ঈমান আনছি এবং তাঁর জামাতের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছি এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে সেই প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী হিসেবে মান্য করি যার ভবিষ্যদ্বাণী হুযুর পাক (সা.) করেছিলেন। এছাড়াও আমরা তো সেই কলেমাই পাঠ করি যা অন্যান্য মুসলমানেরা পাঠ করে। অর্থাৎ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'। আমরাও সেই একই কুরআন পাঠ করি এবং এরই উপর ঈমান আনি। আমরাও ইসলামের সেই নবীর উপরই ঈমান আনি এবং তাঁকে খাতামান্নাবীঈন হিসেবে মান্য করি। অতএব যদি ধর্মবিশ্বাসের নিরিখে দেখা হয় তবে আমরা সেই ব্যক্তির উপর ঈমান আনি যার সম্পর্কে রসূলে করীম (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে তিনি মসীহ মওউদ হবেন- এ বিষয়টি ছাড়া আমাদের এবং অন্যান্য মুসলমানদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অথবা আপনি বলতে পারেন যে, কুরআন করীমের কতিপয় আয়াত রয়েছে যেগুলির ব্যাখ্যা আহমদী মুসলমানেরা অন্যান্য মুসলমানেদের থেকে ভিন্ন করে থাকে, বরং একথা বলা উচিত যে, সঠিকভাবে করে থাকে। কেননা, যে তফসীর বা ব্যাখ্যা আমরা বর্ণনা করে থাকি কুরআন করীমের অন্যান্য আয়াত তার সমর্থন করে, কিন্তু ইসলামের অন্যান্য ফির্কাগুলি, মৌলবী বা অন্যান্য মতবাদের লোকেরা সেই আয়াতগুলিকে নিজের মত করে ব্যাখ্যা করে।

এক অধ্যাপক বলেন, ইসলামের অন্যান্য ফির্কাগুলির মধ্যে এই মতবাদ রয়েছে যে, মাহদী শেষ যুগে আত্মপ্রকাশ করবে। আপনারা এর কি ব্যাখ্যা করেন?

হুযুর বলেন: এরা মনে করে পৃথিবী যখন ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হবে, সেই সময় মসীহ আকাশ থেকে অবতীর্ণ হবে আর মাহদী পৃথিবীতেই জন্ম নিবে। তাদের মতে মসীহ এবং মাহদী দুই ভিন্ন ভিন্ন সত্তার নাম যারা উভয়ে মিলে ইসলামের বিরোধীদের ধ্বংস করবে। প্রশ্ন হল, পৃথিবী যখন এমনিতেই ধ্বংস হতে যাবে, তখন তাদের কাজ কি হবে? পৃথিবীই যদি ধ্বংস হয়ে যায় তবে ইসলামের সংশোধন কিভাবে করবে বা কাকে ইসলাম গ্রহণ করতে বলবে? পথভ্রষ্ট মুসলমানদেরকে কিভাবে সঠিক পথের দিশা দিবে? তাই আমরা বলি যে, শেষ যুগ বলতে সেই দিনকে বোঝানো হয় নি যেদিন পৃথিবী ধ্বংস হতে বসবে, বরং এর দ্বারা চতুর্দশ শতাব্দীকে বোঝানো হয়েছে। কেননা, মহানবী (সা.) একথাও বলেছেন যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে মসীহ ও মাহদীর আবির্ভাব হবে। এছাড়া কুরআন করীমে শেষ যুগের লক্ষণাবলী বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বর্ণিত হয়েছে যে, শেষ যুগে পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থার প্রাচুর্য ও প্রভূত উন্নতি হবে। আমরা আজ এই লক্ষণটি পূর্ণ হতে দেখছি। বাহন হিসেবে উট এবং ঘোড়া পরিত্যক্ত হয়েছে আর এদের স্থানে এসেছে জলজাহাজ, বিমান, গাড়ি, ট্রেন, বাস ইত্যাদি। অনুরূপভাবে রসুলে করীম (সা.) আরও একটি নিদর্শনের ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছিলেন যে, সেই যুগে রমযান মাসের বিশেষ তারিখে চাঁদ ও সূর্য গ্রহণ সংঘটিত হবে। ১৮৯৪ সালে রমযান মাসে এই নিদর্শন পূর্ণ হয় যখন চন্দ্রগ্রহণের দিনগুলির মধ্যে প্রথম দিনটিতে চন্দ্রগ্রহণ হয় আর একই মাসের আঠাশ তারিখে সূর্য গ্রহণ হয়। ১৮৯৪ সালে ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এই দুটি নিদর্শন একই মাসে প্রথমে পূর্ব গোলার্ধে প্রকাশ পায় এবং পুনরায় ১৮৯৫ সালে পশ্চিম গোলার্ধে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের এই নিদর্শন প্রকাশিত হয়। এই নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ার সময় দাবিদারও বিদ্যমান ছিল। আমাদের দাবি হল যখন এই নিদর্শন পূর্ণ হয়েছে আর দাবিদারও রয়েছে তখন তাকে স্বীকার না করার প্রশ্নই ওঠে না। অতএব শেষ যুগ বলতে পৃথিবীর ধ্বংসকে বোঝানো হয় নি। অন্যথায় এমন সময়ে মসীহ ও মাহদী এসে লাভ কি? যদি একথা সত্য হয় যে, শেষ যুগে মসীহ এসে মানুষকে সঠিক পথের দিশা দিবে, তবে মানুষ খোদাকে জিজ্ঞাসা করবে যে, আমাদেরকে নিজেদের পরিবর্তনের সুযোগই দেওয়া হয় নি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমার মতে পৃথিবী ধ্বংসের শেষ মুহূর্তে মসীহ ও মাহদীর আগমণ এক অযৌক্তিক ও অবান্তর বিষয়।

এরপর এক অধ্যাপক প্রশ্ন করেন যে, জামাত আহমদীয়ায় আপনার পদমর্যাদা কি? আপনার ক্রিয়াকলাপ কি কেবল ফিকাহ সংক্রান্ত বিষয়াদি পর্যন্তই সীমিত?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: খলীফা হল নবীর উত্তরাধিকারী। তার কর্তব্য হল সেই সমস্ত দায়িত্বাবলী পালন করা যা নবীদের উপর ন্যস্ত করা হয়। কি এই দায়িত্বাবলী? প্রথমত, মানবজাতিকে স্রষ্টার নিকটবর্তী করা এবং দ্বিতীয়ত মানুষকে মানুষের অধিকারের প্রতি মনোযোগী করে তোলা এবং ইসলামের প্রসার করা। অতএব এই হল খলীফার কর্তব্যাবলী। জাগতিক রাজত্বের মত প্রশাসনিক সর্বময় কর্তা না হয়ে খলীফা হলেন আধ্যাত্মিক পথ-প্রদর্শক। তবে যতদূর তার জামাতের সম্পর্ক, সেখানে তিনি হলেন প্রশাসনিক সর্বময় কর্তা, কিন্তু তিনি জাগতিক রাজত্বের ক্ষেত্রে কর্তা নন। আমাদের ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী ধর্ম এবং সরকার-প্রশাসন পৃথক পৃথক বিষয়। প্রত্যেক সরকার নিজের মত করে শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করবে। যদি সেই সরকারগুলি আহমদী হয়ে থাকে তবে তারা একহাতে ঐক্যবদ্ধ হবে এবং আধ্যাত্মিকভাবে এক খলীফার মাধ্যমে তাদের পথ-প্রদর্শন হবে।

ইসলামি শিক্ষা বিশেষজ্ঞ এক অধ্যাপিকা হুযুর আনোয়ারকে প্রশ্ন করেন যে, আপনাদের কি নিজস্ব স্কুল রয়েছে যেখানে আপনারা নিজের পাঠক্রম অনুসারে শিক্ষাদান করেন?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: এই মূহুর্তে ইউরোপ এবং অন্যান্য পশ্চিমা দেশে আমাদের নিজের কোন স্কুল নেই। আফ্রিকায় আমাদের স্কুল আছে ঠিকই, কিন্তু তা ধর্মীয় স্কুল নয়। সেখানে জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি কুরআন, বাইবেল এবং অন্যান্য ধর্মের মূল গ্রন্থের শিক্ষা দেওয়া হয়। আর যতদূর কোন ধর্মীয় বিষয়ের পাঠক্রমের সম্পর্ক, জার্মানীর একটি আঞ্চলিক প্রশাসন মুসলমানদের বিভিন্ন ফির্কাকে ইসলামের বিষয়ে পাঠক্রম তৈরী করে দিতে বলে যাতে তা স্কুলে পড়ানো যেতে পারে। সেখানে আমরা নিজেদের পাঠক্রম তৈরী করে দিয়েছিলাম। তারা আমাদের পাঠক্রমটিকেই স্কীকার করে এবং সেটিই স্কুলগুলিতে পড়ানো হচ্ছে। এই পাঠক্রমে বিতর্কিত বিষয়গুলিকে এড়িয়ে আমরা কুরআন করীম, রসুল করীম (সা.)-এর হাদীস এবং ইসলামের প্রকৃত ইতিহাসকে স্থান দিয়েছি যা সকলের মধ্যে অভিন্ন বা সাদৃশ্যপূর্ণ।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এছাড়া আমাদের মিশনারী ট্রেনিং কলেজ রয়েছে। ইউরোপের মধ্যে জার্মানিতে একটি কলেজ রয়েছে এবং যুক্তরাজ্যে একটি। অনুরূপভাবে কানাডাতে এবং আফ্রিকাতেও আন্তর্জাতিক কলেজ রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে ইন্ডোনেশিয়া, আর সংক্ষিপ্ত কোর্সের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই কলেজগুলি রয়েছে।

হুযুর আনোয়ার মুবাল্লিগ কাশেফ মাহমুদ ওয়ারক সাহেবের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, ইনিও যুক্তাজ্যের মিশনারী ট্রেনিং কলেজ থেকে শিক্ষার্জন করেছেন। সম্ভবত তিনি এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রথম পাস আউট-দের অন্তর্ভুক্ত। আপনি বলতে পারেন, কলেজের প্রারম্ভিক ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত।

এরপর আরেক অধ্যাপক বলেন, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের সরকারের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে জামাত আহমদীয়ার কোন উন্নতি হয়েছে?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: যতদূর বাংলাদেশ সরকারের সাথে জামাতের সম্পর্কের প্রশ্ন, সেখানে আমাদের জামাতের খুব ভাল সম্পর্ক রয়েছে। কেননা, বাংলাদেশে জামাতের বিরুদ্ধে কোন আইন নেই। কিন্তু যতদূর পাকিস্তানের সম্পর্ক, সেখানে সরকার ১৯৭৪ সালে আহমদীদের বিরুদ্ধে সেখানকার সংসদে আইন প্রণীত হয়। সেই আইন অনুসারে আহমদীরা মুসলমান নয়। তাই সেখানে আহমদীদের বিরুদ্ধে আইন তৈরী হয়ে আছে। এই আইনে যিয়াউল হক প্রশাসনের যুগে মার্শল ল' আইন সংযোজন করা হয়। প্রথমে কেবল পার্লামেন্টে এই আইন পাস করা হয় যে, আমরা মুসলমান নই, কিন্তু তা তেমন কোন পার্থক্য গড়ে তুলত না। পার্লামেন্ট যা কিছু মনে করুক, আমরা নিজেদেরকে মুসলমান মনে করতাম। কিন্তু যিয়াউল হক যে আইন বলবৎ করেছে সেই আইন অনুসারে আমরা নিজেদেরকে মুসলমান বলতে পারি না। আমরা বাচ্চাদের নাম মুসলমানদের মত রাখতে পারি না। আমরা নিজেদের মসজিদকে মসজিদ বলতে পারি না। এমনকি একে অপরকে ইসলামী রীতি অনুযায়ী আসসালামো আলাইকুমও বলতে পারি না। অতএব যতদিন পর্যন্ত এই আইন বলবৎ রয়েছে এবং এর আড়ালে আমাদের উপর অত্যাচারের ধারা অব্যাহত রয়েছে, ততদিন পর্যন্ত পাকিস্তানে আমাদের অবস্থা এবং সম্পর্ক কিভাবে উন্নত হতে পারে? কিন্তু বাংলাদেশে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই এর সম্পর্ক সরকারী নীতির সঙ্গে। বাংলাদেশ জামাতের বর্তমান সরকারের সঙ্গে সুসম্পর্ক রয়েছে।

এরপর পাদ্রী সাহেব প্রশ্ন করেন যে, গতকাল দশ বছর বয়সের ছেলেরা চার্চে এসেছিল। আমি তাদেরকে বাপতাইজ করার পদ্ধতি শেখাই। এক কিশোর আমাকে প্রশ্ন

করে যে, যখন মুসলমানদের ঘরে সন্তান জন্ম নেয়, আর আপনি যদি বাপতিসমা করেন তবে তাকে কি মুসলমান বলা হবে? এর উত্তরে আমি তাকে বলি, এর সম্পর্কে আমি জানি না। কিন্তু আমি যদি বাপতাইজ করি তবে হয়তো তাকে খৃষ্টান বলা হবে বা মুসলমানই বলা হবে। পাদ্রী সাহেব জিজ্ঞাসা করেন, এমন পরিস্থিতিতে আপনি কি উত্তর দিয়ে থাকেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন: ইসলামের পয়গম্বার (সা.) বলেছেন, প্রত্যেক শিশু পবিত্র প্রকৃতি নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়। ধর্মীয়ভাবে সে না মুসলমান হয়, না খৃষ্টান হয় না ইহুদী হয়। কিন্তু তার প্রকৃতিতে পুণ্য থাকে। পরবর্তীতে তার পিতামাতা যেমনটি চান তার লালন পালন করেন। তাই যাকে বাপতিসমা করেন তাকে খৃষ্টানই বলা হবে। কিন্তু আমি একথা বলতে পারি না যে, কোন খৃষ্টান পুণ্যময় প্রকৃতির হতে পারে না। তাই আমার মতে প্রত্যেক শিশু পবিত্র প্রকৃতি নিয়ে জন্ম নেয়।

হুযুর আনোয়ার ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে সম্বোধন করে বলেন, জামাত আহমদীয়ার সূচনা ভারত থেকেই হয়েছিল। কাদিয়ান নামক পাঞ্জাবের একটি ছোট্ট গ্রাম থেকে এর উৎপত্তি।

হুযুর আনোয়ারের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, এমনিতে আমি দিল্লীর বাসিন্দা, কিন্তু আমার শিকড় রয়েছে পূর্ব বঙ্গে।

তিনি বলেন, ভারতে আপনাদের জামাতের বর্তমান পরিস্থিতি দেখে বোঝা যায় যে, ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র এবং আমরা বিশ্বাস করি, প্রত্যেক ধর্মের সম্মান হওয়া উচিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন: একথা সম্পূর্ণ সঠিক। ভারতের বর্তমান সরকারের সঙ্গে জামাতের সম্পর্ক খুব ভাল।

ভারতের দূত বলেন, সম্প্রতি সুফিদের এক সম্মেলনে আমাদের প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, ইসলাম একটি শান্তির ধর্ম এবং এটিকে পৃথিবীতে ভুলভাবে উগ্রবাদী ধর্ম হিসেবে দেখানো হচ্ছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনার কথা সম্পূর্ণ ঠিক। প্রত্যেক ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা শান্তি, প্রীতি ও সমন্বয় ভিত্তিক হয়ে থাকে। আল্লাহকে ভালবাস এবং মানুষকে ভালবাস।

এরপর হুযুর আনোয়ার সুইডেনে নিযুক্ত ইজরায়েলের রাষ্ট্রদূতকে সম্বোধন করে বলেন: ইজরায়েলেও আমাদের জামাত রয়েছে।

রাষ্ট্রদূত বলেন: আমাদের জন্য এটি গর্বের বিষয় যে, ইসলামের একটি শান্তিপ্রিয় দল আমাদের দেশে রয়েছে। এর জন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

তিনি বলেন: এখানে সুইডেনে আহমদীদের সাথে আমাদের সুসম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, সুইডেনে অন্যান্য মুসলমানদের সঙ্গে আমাদের এমন সম্পর্ক নেই।

এর প্রতিক্রিয়ায় হুযুর আনোয়ার বলেন: ইজরায়েলে যে আহমদীরা বসবাস করছে, তারা অন্যান্য মুসলমান এবং ইহুদীদের মধ্যে এক প্রকারের সালিসির ভূমিকা পালন করছে।

রাষ্ট্রদূত বলেন: চেষ্টা সত্ত্বেও আমরা এখানে সুইডেনে মুসলমানদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী করতে পারি নি। এরা ইহুদীদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেই চায় না। এই কারণে আমি আপনার প্রতি অনেক কৃতজ্ঞ যে, আপনি কেবল শান্তির শিক্ষা প্রসারের কাজেই প্রচেষ্টারত নন, বরং নিজেও এই শিক্ষামালা মেনে চলেন।

এরপর এক অধ্যাপক প্রশ্ন করে বলেন: মুসলিম দেশগুলির অন্যান্য স্থানেও মাহদীর দাবিদার মজুদ আছে। যেমন সুদানে এক ব্যক্তি মাহদী হওয়ার দাবি করেছিল। অনুরূপভাবে ১৯৭৯ সালে সৌদি আরবেও জনৈক ব্যক্তি মাহদী হওয়ার দাবি করেছিল। এই সমস্ত দাবিদারদের সম্পর্কে জামাত আহমদীয়ার দৃষ্টিভঙ্গি কি?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: দাবিদার তো অনেকেই হতে পারে। কিন্তু লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, দাবিকারক কতদূর পর্যন্ত সফল হয়েছে? যেরূপ আমি পূর্বেও বলেছি, রসূলে করীম (সা.) মাহদীর আবির্ভাব সম্পর্কে কিছু নিদর্শনাবলীর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যেগুলি চতুর্দশ শতাব্দীতে পূর্ণ হয়েছে আর সেই সময় মাহদীর দাবিকারক বিদ্যমান ছিল। সেই সময় অন্য কোন ব্যক্তি এই দাবি করে নি। এছাড়াও রসুলে করীম (সা.) এই ভবিষ্যদ্বাণীও করেছিলেন যে, মসীহ ও মাহদী একই ব্যক্তি হবে। অথচ প্রত্যেক দাবিকারক নিজেকে কেবল মাহদী হওয়ার দাবিই করেছে। কিন্তু হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, একই ব্যক্তিকে দুইটি উপাধি দেওয়া হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: দ্বিতীয় কথা হল, মাহদী হওয়ার দাবিকারক এই সব লোকেরা কত দূর অগ্রসর হতে পেরেছে? পৃথিবীর কতগুলি দেশে পৌঁছেছে? কিন্তু জামাত আহমদীয়া বিগত ১২৭ বছরে ক্রমোন্নতির ধারা বজায় রেখে নতুন নতুন ফলক স্থাপন করে চলেছে এবং বিশ্বব্যাপী তার বাণী প্রসার লাভ করছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এটাও হতে পারে যে, কিছু পুণ্যবান এবং আওলিয়াও আছেন যাদের অনুসারীরাই হয়তো তাঁদেরকে মাহদী উপাধি দিয়েছে। কিন্তু এমন ব্যক্তিরা কেবল বিশেষ অঞ্চল এবং বিশেষ জাতির জন্য ছিলেন।

এরপর অধ্যাপক সাহেব প্রশ্ন করেন যে, জামাত আহমদীয়াতেও দুটি দল রয়েছে। একটি দলের সম্পর্ক কাদিয়ানের সঙ্গে এবং দ্বিতীয় দলটি লাহোরী হিসেবে পরিচিত। এদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কি?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: লাহোরী আহমদীরা খিলাফত ব্যবস্থাপনাকে স্বীকার করে না। এই কারণেই তারা আমাদের থেকে পৃথক হয়েছিল। তাদের মতে, জামাতী বিষয়াদির ব্যবস্থাপনার নিয়ন্ত্রণ এক খলীফার হাতে না থেকে একটি কমিটি বা কয়েকজন ব্যক্তি সম্মিলিত দলের কাছে থাকা উচিত। কিন্তু আমাদের মতে, নবীর পর খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এটিই ছিল সেই মূল কারণ যার ফলে তারা জামাত থেকে পৃথক হয়ে গেছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যতদূর আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রশ্ন, আমরা যখনই সঙ্গে সাক্ষাত করি আমরা পরস্পরের প্রতি শুভেচ্ছা বিনিময় করে থাকি। দুই তিন বছর পূর্বে আমি বার্লিনে তাদের এক মসজিদেও গিয়েছিলাম আর সেই মসজিদের ইমাম আমাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। তিনি আমাদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন আর এঁরা আমাদের অনুষ্ঠানগুলিতে প্রায়ই অংশ গ্রহণ করে থাকেন। আমাদের মধ্যে খুব বেশি বিদ্বেষ বা বৈরিতা নেই। কিন্তু আসল কথা হল, আমাদের জামাত বৃদ্ধি পাচ্ছে আর তাদের সংখ্যা ক্রমশঃ কমে আসছে। এমনকি তাদের মধ্যে থেকেও একটি বড় সংখ্যক সদস্য আমাদের জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

এরপর আরেক অধ্যাপক প্রশ্ন করেন যে, আপনি একটু আগেই বললেন, খলীফা হলেন একজন আধ্যাত্মিক নেতা। তাই আপনার মতে বর্তমানে জামাত আহমদীয়া এবং অবশিষ্ট বিশ্ব আধ্যাত্মিকভাবে কোন কঠিনতম চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনার সঙ্গে পাদ্রী সাহেব বসে আছেন। তিনিও ভালভাবে জানেন যে, মানুষ তাদের প্রকৃত স্রষ্টা থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে এবং স্রষ্টার অধিকারসমূহ প্রদান করতে ভুলে যাচ্ছে। তাই সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ হল মানুষকে তাদের স্রষ্টার নিকটবর্তী করা। কেননা, কুরআন করীম অনুসারে মানুষ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যই হল সে যেন স্রষ্টার সামনে নতজানু হয়। যদি আপনার সৃষ্টির এটিই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে এটিই সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ।

অধ্যাপক মহাশয় বলেন: এই দৃষ্টিকোণ থেকে জটিলতা কি আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: এই জটিলতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বলা হচ্ছে যে, কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই কয়েকবছর পূর্বে পর্যন্ত ৭৭ শতাংশ মানুষ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হত বা অন্ততঃপক্ষে খৃষ্টবাদে বিশ্বাসী ছিল। বর্তমানে এই সংখ্যা হ্রাস পেয়ে পঞ্চাশ শতাংশে দাঁড়িয়েছে আর এই সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। আপনারা হয়তো নিজেরাই লক্ষ্য করেছেন যে, নাস্তিকদের সংখ্যা দিনের দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এর বিপরীতে আস্তিকদের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। তাই এটি আমাদের সকলের জন্যই একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সর্বপ্রথম মানবজাতিকে তাদের স্রষ্টার নিকটে নিয়ে আসতে হবে এবং পরে নির্ধারিত হবে যে কোন ধর্ম অনুসরণ করা হবে।

এরপর আরেক অধ্যাপক প্রশ্ন করেন যে, পরিবেশ সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: পরিবেশ বলতে আপনি যদি জলবায়ু পরিবর্তনকে বোঝাতে চাইছেন, তবে এর মূল কারণ হল ভারসাম্যহীনতা। প্রকৃতি প্রত্যেকটি জিনিসের মধ্যে ভারসাম্য রেখেছে। পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে আমরা বন-জঙ্গল কেটে পরিস্কার করে চলেছি আর নতুন নতুন শহর ও গ্রাম গড়ে তুলছি। এক্ষেত্রে উত্তোরত্তর বৃদ্ধি ঘটছে। অপরদিকে শিল্প-বিপ্লব ঘটে চলেছে। এই সমস্ত কারণে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। অতএব, প্রত্যেকটি বিষয়ে ভারসাম্য বজায় রাখা আবশ্যক।

দ্বিতীয় বিষয়টি হল শান্তি হারিয়ে যাওয়া। যদি শান্তি না থাকে তবে মানুষ পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে আর হত্যা করবে। তাই যেখানে জীবনই নেই সেখানে পরিবেশ কি করবে?

এক অধ্যাপক প্রশ্ন করেন, আপনি জামাত আহমদীয়ায় 'ফিকাহ'-সংক্রান্ত বিষয়াবলীর নিরসন কিভাবে করেন?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আমরা মূলত হানাফী ফিকাহ মেনে চলি। আমরা যখন কিছু বিষয় এমন দেখি যেগুলির সমাধান হানাফি

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 3 Thursday, 2 Aug, 2018 Issue No.31

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

ফিকাহতে পাওয়া যায় না, তখন আমরা কুরআন এবং রসুল করীম (সা.)-এর হাদীসের আলোকে সেগুলির সমাধান করি। খুব কম বিষয়েই আমাদের এবং হানাফীদের মধ্যে মতবিরোধ আছে।

এক অধ্যাপক বলেন: আমি জেনেছি যে, আহমদীরা হজ্জ করতে গিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হয়। তবে কি আপনারা হজ্জের পরিবর্তে অন্য কিছু করেন?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: হজ্জের পরিবর্ত অন্য কিছু নেই। ইসলামের মূল স্তম্ভগুলি হল- কলেমা, নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জ। হজ্জ হল ইসলামের মূল স্তম্ভগুলির একটি। যদিও আমাদেরকে হজ্জে যেতে বাধা দেওয়া হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রতি বছর বেশ বড়সড় সংখ্যক আহমদীরা হজ্জে যান। কিন্তু সেখানে তারা নিজেদেরকে আহমদী বলে পরিচয় দিতে পারে না। এই দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু সমস্যা যদিও আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা হজ্জ করেন। আমার পূর্বের খলীফারা হজ্জ করেছেন। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় খলীফাও হজ্জ করেছেন। এছাড়া তাঁর সন্তানেরাও হজ্জ করেছেন। আমার বড় ভাইও দুই বছর পূর্বে হজ্জ করেছেন।

এর প্রতিক্রিয়ায় এক অধ্যাপিকা বলেন: মক্কা ছাড়াও হজ্জের জন্য আপনাদের অন্য কোন জায়গা আছে?

হুযুর আনোয়ার উত্তরে বলেন: না। মক্কার পরিবর্ত অন্য কোন স্থান হতে পারে না।

এর প্রতিক্রিয়ায় ভদ্রমহিলা বলেন: মক্কার পরিবর্ত নয়, কিন্তু অনেক সময় মানুষ মাযার বা এই ধরণের স্থানে যায়।

হুযুর বলেন: মাযার নয়, কিন্তু আমাদেরও কিছু পবিত্র-স্থানসমূহ রয়েছে। যেমন-কাদিয়ান, যা জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতার জন্মভূমি ছিল। এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত পবিত্র স্থান। কেননা, তিনি সেখানে জন্মগ্রহণ করেছেন, বসবাস করেছেন এবং সেখানেই সমাহিত হয়েছেন। কিন্তু আপনি একথা বলতে পারেন না, যে কাদিয়ান এবং মক্কার মর্যাদা এক।

এক অধ্যাপক প্রশ্ন করেন যে, আপনাকে কি আপনার পূর্বের খলীফা খিলাফতের জন্য নামাঙ্কিত করেছিলেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: না। আমাদের একটি নির্বাচনী বৈঠক হয় যার সদস্যরা হলেন জামাত আহমদীয়ার কয়েকজন সদস্য। সেই সব সদস্যদের মধ্যে থাকেন কেন্দ্রীয় পদাধিকারী, দেশের আমীর এবং কয়েকজন সিনিয়র মুবাল্লিগ, যারা খলীফার মৃত্যুর পর একত্রিত হন এবং নতুন খলীফার নির্বাচন করেন। খিলাফতের জন্য নাম উত্থাপিত হয় এবং তাকে ভোট দেওয়া হয়। সমস্ত প্রক্রিয়া যথারীতি রেকর্ডিং করা হয়। ঠিক তদনুরূপ যেভাবে পোপ নির্বাচন করা হয়। কিন্তু আমাদের এখানে কোন চিমনী থাকে না যা দিয়ে ধোঁয়া বের হয়, বরং খলীফা নির্বাচন সম্পন্ন হলে জামাতের সদস্যবর্গ নতুন খলীফার হাতে বয়আত (দীক্ষা) নেয়।

এক অধ্যাপক প্রশ্ন করেন যে, জামাত আহমদীয়ার মধ্যে কোন কোন জাতি অন্তর্ভুক্ত? সদস্যদের অধিকাংশই কি দক্ষিণ এশিয়া থেকে না কি অন্যান্য জাতি থেকেও আহমদী আছেন?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আমার মতে এই মূহুর্তে আফ্রিকান আহমদীদের সংখ্যা ভারত ও পাকিস্তানের আহমদীদের থেকে বেশি। যদিও পাকিস্তান ও ভারতের আহমদীরা আমেরিকা, ইউরোপ এবং সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে, কিন্তু আফ্রিকান আহমদীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়াও সুদূর প্রাচ্যেও যথেষ্ট সংখ্যক আহমদী রয়েছেন। যেমন-ইন্ডোনেশিয়া, মালেয়েশিয়া ইত্যাদি।

এক অধ্যাপিকা বলেন: জামাত আহমদীয়ায় মহিলাদের ভূমিকা কি?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: জামাত আহমদীয়ায় মহিলাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, রসুলে করীম (সা.)-এর একটি হাদীস রয়েছে- 'জান্নাত রয়েছে মায়ের পায়ের নীচে।' এর অর্থ হল, মহিলা যদি সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে নিজের যথাযথ ভূমিকা পালন না করে, তবে সে না কেবল নিজে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হয়, বরং নিজের সন্তানদেরকেও জান্নাত থেকে বঞ্চিত করে। অতএব এটিই মূল নীতি। এই কারণে আমরা জামাত আহমদীয়ার মধ্যে মহিলাদের একটি পৃথক সংগঠন তৈরী করে রেখেছি।

(ক্রমশঃ.....)

মোখাতেবা (খোদার সহিত বাক্যালাপ)-এর নেয়ামত হইতে বঞ্চিত রাখিবেন না। তিনি পূর্ববর্তী উম্মতকে যে সকল নেয়ামত দান করিয়াছিলেন তাহা সবই তিনি তোমাদিগকে দান করিবেন। কিন্তু যে ব্যক্তি ধৃষ্টতাপূর্বক খোদাতালার উপর মিথ্যা আরোপ করিয়া বলিবে যে, তিনি তাহার প্রতি ওহী নাযেল করিয়াছেন অথচ প্রকৃতপক্ষে তাহার প্রতি কোন ওহী নাযেল হয় নাই, অথবা বলিবে যে, খোদাতালার সাথে সে বাক্যালাপের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে অথচ সে তাহা লাভ করে নাই, আমি তদ্রুপ ব্যক্তি সম্বন্ধে খোদাতালা ও তাঁহার ফেরেশতাকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি - সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। কারণ সে আপন স্রষ্টার প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়াছে, তাঁহার সহিত প্রতারণা করিয়াছে এবং অত্যন্ত দুঃসাহস ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছে। সুতরাং তোমরা এই পরিণতিকে ভয় কর। ধিক্ সেই সকল ব্যক্তিকে যাহারা মিথ্যা স্বপ্ন রচনা করে এবং খোদাতালার সহিত বাক্যালাপের মিথ্যা দাবী করে। এইরূপ ব্যক্তি যেন খোদা আছেন বলিয়া মনে করে না। ফলে খোদাতালার কঠোর শাস্তি তাহাদিগকে পাকড়াও করিবে। তাহাদিগের দুঃখের অবসান হইবে না।

সুতরাং তোমরা নিষ্ঠা, সততা, ধর্মভীতি ও ঐশীপ্রেমে উন্নতি কর এবং ইহাকেই জীবনের ব্রত মনে কর। তাহা হইলে খোদাতালা তোমাদের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা করেন, আপন বাক্যালাপের মর্যাদাও দান করিবেন। এইরূপ বাক্যালাপের আকাঙ্খাও তোমাদের পোষণ করা উচিত নহে, কেননা প্রবৃত্তির এইরূপ কামনার দরুন শয়তানী প্ররোচনা আরম্ভ হইয়া যাইতে পারে যাহার ফলে অনেকে ধ্বংস হয়। অতএব তোমরা ধর্ম-সেবায় ও উপাসনায় রত থাক। তোমাদের সকল প্রচেষ্টা ইহাতেই নিয়োজিত করা উচিত যাহাতে তোমরা খোদাতালার সমুদয় আদেশ সুষ্ঠুভাবে পালন করিতে পার, এবং নাজাত লাভের উদ্দেশ্যে ঈমানের উন্নতির জন্য প্রার্থনা কর, ইলহাম দেখাইবার উদ্দেশ্যে নহে।

** হেদায়াতের দ্বিতীয় উপায় 'সুন্নত' অর্থাৎ আঁ-হযরত (সা.)-এর ঐ পবিত্র জীবনাদর্শ যাহা তিনি আপন ক্রিয়া-কলাপ দ্বারা দেখাইয়াছেন। যথা তিনি নামায পড়িয়া দেখাইয়াছেন যে, কিরূপে নামায পড়িতে হয়। রোযা রাখিয়া দেখাইয়াছেন যে, কিভাবে রোযা রাখিতে হয়, ইহারই নাম সুন্নত, অর্থাৎ আঁ-হযরত (সা.)-এর কর্মপদ্ধতি যদ্বারা তিনি আল্লাহর আদেশকে কার্যে পরিণত করিয়া দেখাইয়াছেন, উহারই নাম সুন্নত। হেদায়াতের তৃতীয় উপায় 'হাদীস' অর্থাৎ আঁ হযরত (সা.)-এর বাণী, যাহা তাঁহার তিরোধানের পর সংকলন করা হইয়াছে। হাদীসের মর্যাদা কুরআন শরীফ এবং সুন্নত হইতে অপেক্ষাকৃত কম, কারণ অধিকাংশ হাদীস আনুমানিক, কিন্তু হাদীস যখন সুন্নত দ্বারা সমর্থিত হয়, তখন উহা সন্দেহ-বিহীন হইয়া যায়।*

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন,খণ্ড-১৯, পৃষ্ঠা: ২৩-২৬)

বদর পত্রিকা সংরক্ষণ করুন

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগের স্মারক 'বদর পত্রিকা' ১৯৫২ সাল থেকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাদিয়ান দারুল আমান থেকে প্রকাশিত হচ্ছে এবং জামাত আহমদীয়ার সদস্যদের ধর্মীয় চাহিদা পূরণ করে চলেছে। এতে কুরআনের আয়াত, মহানবী (সা.)-এর হাদীস, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মালফুযাত ও লেখনী ছাড়াও সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাম্প্রতিক খুতবা ও ভাষণ, বার্তা, প্রশ্নোত্তর আকারে খুতবা জুমা, হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সফরের ধর্মীয় ও জাগতিক জ্ঞান সমৃদ্ধ ঈমান উদ্দীপক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়ে থাকে। এর অধ্যায়ন করা, অপরের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং এর মাধ্যমে সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষা করা আমাদের সকলের কর্তব্য। এই সমস্ত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বদর পত্রিকার প্রত্যেকটি সংখ্যা যত্ন করে নিজের কাছে রেখে দেওয়া আমাদের সকলের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষা সম্বলিত এই পবিত্র পত্রিকা সম্মানের দাবি রাখে। অতএব এটিকে বাতিল কাগজ হিসেবে বিক্রি করা এর সম্মানকে পদদলিত করার নামান্তর। এটিকে যত্ন করে রাখা যদি সম্ভব না হয়, তবে সেগুলিকে অতি সাবধানে নষ্ট করে দিন যাতে এই পবিত্র লেখনী গুলির অসম্মান না হয়। আশা করা যায়, জামাতের সদস্যবর্গ এদিকে বিশেষ মনোযোগ দিবেন এবং এর থেকে যথাসম্ভব উপকৃত হওয়ার মাধ্যমে বিষয়গুলিকে দৃষ্টিপটে রাখবেন।

(সম্পাদকীয়)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir.